আশ্ শু'আরা

২৬

নামকরণ

২২৪ আয়াতের وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ থেকে সূরার নামটি গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে বুঝা যাচ্ছে এবং হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে যে, এ সূরাটির নাযিলের সময়–কাল হচ্ছে মক্কার মধ্যবর্তীকালীন যুগ। ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনামতে প্রথমে সূরা তা–হা নাযিল হয়, তারপর ওয়াকি'আহ এবং এরপর সূরা আশ্ শু'আরা। (রূহুল মাআনী, ১৯ খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা) আর সূরা তা–হা সম্পর্কে জানা আছে, এটি হযরত উমরের (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

ভাষণের পটভূমি হচ্ছে, মক্কার কাফেররা লাগাতার অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের মোকাবিলা করছিল। এ জন্য তারা বিভিন্ন রকমের বাহানাবাজীর আশ্রয় নিচ্ছিল। কখনো বলতো, তুমি তো আমাদের কোন চিহ্ন দেখালে না, তাহলে আমরা কেমন করে তোমাকে নবী বলে মেনে নেবো। কখনো তাঁকে কবি ও গণক আখ্যা দিয়ে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলীকে কথার মারপ্যাঁচে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতো। আবার কখনো তাঁর মিশনকে হালকা ও গুরুত্বহীন করে দেবার জন্য বলতো, কয়েকজন মূর্খ ও অর্বাচীন যুবক অথবা সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে, অথচ এ শিক্ষা যদি তেমন প্রেরণাদায়ক ও প্রাণপ্রবাহে পূর্ণ হতো তাহলে জাতির শ্রেষ্ঠ লোকেরা, পণ্ডিত, জ্ঞানী–গুণী ও সরদাররা একে গ্রহণ করে নিতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে তাদের আকীদা–বিশ্বাসের ভ্রান্তি এবং তাওহীদ ও আখেরাতের সত্যতা বুঝাবার চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু তারা হঠকারিতার নিত্য নতুন পথ অবলম্বন করতে কখনোই ক্লান্ত হতো না। এ জিনিসটি রসূলুল্লাহর (সা) জন্য অসহ্য মর্মযাতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এ দুঃখে তিনি চরম মানসিক পীড়ন অনুভব করছিলেন।

এহেন অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয়। বক্তব্যের সূচনা এভাবে হয় ঃ তুমি এদের জন্য ভাবতে ভাবতে নিজের প্রাণ শক্তি ধ্বংস করে দিচ্ছো কেন? এরা কোন নিদর্শন দেখেনি,

এটাই এদের ঈমান না আনার কারণ নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, এরা একগুয়ে ও হঠকারী। এরা বুঝালেও বুঝে না। এরা এমন কোন নিদর্শনের প্রত্যাশী, যা জোরপূর্বক এদের মাথা নুইয়ে দেবে। আর এ নিদর্শন যথাসময়ে যখন এসে যাবে তখন তারা নিজেরাই জানতে পারবে, যে কথা তাদেরকে বুঝানো হচ্ছিল তা একেবারেই সঠিক ও সত্য ছিল। এ ভূমিকার পর দশ রুকূ' পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, সত্য প্রত্যাশীদের জন্য আল্লাহর দুনিয়ায় সর্বত্র নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলো দেখে তারা সত্যকে চিনতে পারে। কিন্তু হঠকারীরা কখনো বিশ্ব–জগতের নিদর্শনাদি এবং নবীদের মু'জিযাসমূহ তথা কোন জিনিস দেখেও ঈমান আনেনি। যতক্ষণ না আল্লাহর আযাব এসে তাদরেকে পাকড়াও করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের গোমরাহীর ওপর অবিচল থেকেছে। এ সম্বন্ধের প্রেক্ষিতে এখানে ইতিহাসের সাতটি জাতির অবস্থা পেশ করা হয়েছে। মক্কার কাফেররা এ সময় যে হঠকারী নীতি অবলম্বন করে চলছিল ইতিহাসের এ সাতটি জাতিও সেকালে সেই একই নীতির আশ্রয় নিয়েছিল। এ ঐতিহাসিক বর্ণনার আওতাধীনে কতিপয় কথা মানস পটে অংকিত করে দেয়া হয়েছে।

এক ঃ নিদর্শন দু' ধরনের। এক ধরনের নিদর্শন আল্লাহর যমীনে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলো দেখে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি নবী যে জিনিসের দিকে আহবান জানাচ্ছেন সেটি সত্য হতে পারে কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের নিদর্শন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় দেখেছে, নূহের সম্প্রদায় দেখেছে, আদ ও সামূদ দেখেছে, লূতের সম্প্রদায় ও আইকাবাসীরাও দেখেছে। এখন কাফেররা কোন্ ধরনের নিদর্শন দেখতে চায় এটা তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

দুই ঃ সকল যুগে কাফেরদের মনোভাব একই রকম ছিল। তাদের যুক্তি ছিল একই প্রকার। তাদের আপত্তি ছিল একই। ঈমান না আনার জন্য তারা একই বাহানাবাজীর আশ্রয় নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা একই পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক নবীর শিক্ষা একই ছিল। তাদের চরিত্র ও জীবননীতি একই রঙে রঞ্জিত ছিল। নিজেদের বিরোধীদের মোকাবিলায় তাঁদের যুক্তি–প্রমাণের ধরন ছিল একই। আর তাঁদের সবার সাথে আল্লাহর রহমতও ছিল একই ধরনের। এ দু'টি আদর্শের উপস্থিতি ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। কাফেররা নিজেরাই দেখতে পারে তাদের নিজেদের কোন্ ধরনের ছবি পাওয়া যায় এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিসত্তায় কোন্ ধরনের আদর্শের নিদর্শন পাওয়া যায়।

তৃতীয় যে কথাটির বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আল্লাহ একদিকে যেমন অজেয় শক্তি, পরাক্রম ও ক্ষমতার অধিকারী অপরদিকে তেমনি পরম করুণাময়ও। ইতিহাসে একদিকে রয়েছে তাঁর ক্রোধের দৃষ্টান্ত এবং অন্যদিকে রহমতেরও। এখন লোকদের নিজেদেরকেই এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা নিজেদের তাঁর রহমতের যোগ্য বানাবে না ক্রোধের।

শেষ রুকূ'তে এ আলোচনাটির উপসংহার টানতে গিয়ে বলা হয়েছে, তোমরা যদি নিদর্শনই দেখতে চাও, তাহলে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো যেসব ভয়াবহ নিদর্শন দেখেছিল সেগুলো দেখতে চাও কেন? এ কুরআনকে দেখো। এটি তোমাদের নিজেদের ভাষায় রয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখো। তাঁর সাথীদেরকে দেখো।

এটি কি কোন শয়তান বা জিনের বাণী হতে পারে? এ বাণীর উপস্থাপককে কি তোমাদের গণৎকার বলে মনে হচ্ছে? মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদেরকে কি তোমরা কবি ও তাদের সহযোগী ও সমমনারা যেমন হয় তেমনি ধরনের দেখেছো? জিদ ও হঠকারিতার কথা আলাদা। কিন্তু নিজেদের অন্তরের অন্তস্থলে উঁকি দিয়ে দেখো সেখানে কি এর সমর্থন পাওয়া যায়? যদি মনে মনে তোমরা নিজেরাই জানো গণকবৃত্তি ও কাব্যচর্চার সাথে তাঁর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই, তাহলে এই সাথে একথাও জেনে নাও, তোমরা জুলুম করছো, কাজেই জালেমের পরিণামই তোমাদের ভোগ করতে হবে।

طٰسٓمٓ ① تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ② لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ③ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ④

তা–সীন–মীম। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।[১] হে মুহাম্মাদ! এ লোকেরা ঈমান আনছে না বলে তুমি যেন দুঃখে নিজের প্রাণ বিনষ্ট করে দিতে বসেছ।[২] আমি চাইলে আকাশ থেকে এমন নিদর্শন অবতীর্ণ করতে পারতাম যার ফলে তাদের ঘাড় তার সামনে নত হয়ে যেতো।[৩]

১. অর্থাৎ এ সূরার যে আয়াতগুলো পেশ করা হচ্ছে এগুলো এমন একটি কিতাবের আয়াত যা তার বক্তব্য পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করেছে। এগুলো পড়ে বা শুনে যে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে এগুলো কোন্ জিনিসের দিকে আহবান জানাচ্ছে, কোন্ জিনিস থেকে বিরত রাখছে, কাকে সত্য বলছে এবং কাকে মিথ্যা গণ্য করছে। মেনে নেয়া বা না মেনে নেয়া আলাদা কথা কিন্তু এর শিক্ষা বুঝা যায়নি এবং এ কিতাব কি ত্যাগ করার এবং কি গ্রহণ করার আহবান জানাচ্ছে এ থেকে তা জানতেই পারা যায়নি এমন কথা বলার অবকাশ কোন ব্যক্তির নেই।

কুরআনকে "আল কিতাবুল মুবীন" বা সুস্পষ্ট কিতাব বলার আরো একটি অর্থও আছে। সেটি হচ্ছে, এটি যে আল্লাহর কিতাব সে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত। এর ভাষা, বর্ণনা, বিষয়বস্তু এবং এর উপস্থাপিত সত্য ও এর নাযিল হবার অবস্থা সবকিছু পরিষ্কার বলে দিচ্ছে—এটি বিশ্ব–জগতের প্রভুরই কিতাব। এদিক দিয়ে বিচার করলে এ কিতাবের প্রত্যেকটি বাক্যই একটি নিদর্শন ও মু'জিযা। কোন ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি–বিবেক ব্যবহার করলে তার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য পৃথক কোন নিদর্শনের প্রয়োজনই হয় না। সুস্পষ্ট কিতাবের এ "আয়াত" তথা নিদর্শন তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য যথেষ্ট।

সামনের দিকে এ সূরায় যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে এ ছোট্ট প্রারম্ভিক বাক্যটি নিজের দ্বিবিধ অর্থের দৃষ্টিতে তার সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক রাখে। মক্কার কাফেররা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মু'জিযার দাবী জানাচ্ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, এ মু'জিযা দেখে তিনি যে সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পয়গাম এনেছেন সে ব্যাপারে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবে। বলা হয়েছে, সত্যিই যদি ঈমান আনার জন্য কেউ নিদর্শনের দাবী করে থাকে, তাহলে তো "কিতাবুল মুবীন" তথা সুস্পষ্ট কিতাবের এ আয়াতগুলোই সে জন্য যথেষ্ট। অনুরূপভাবে কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে দোষারোপ করতো এ মর্মে যে, তিনি কবি বা গণক। বলা হয়েছে, এ কিতাবটি তো কোন হেঁয়ালী বা ধাঁধা নয়। কিতাবটি পরিষ্কারভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের শিক্ষা পেশ করছে। নিজেই দেখে নাও, এ শিক্ষা কি কোন কবি বা গণকের হতে পারে? (তারা তো সচরাচর হেঁয়ালীপূর্ণ কথা বলতে অভ্যস্ত)

২. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা কাহ্ফে বলা হয়েছেঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا

"এরা এ শিক্ষার প্রতি ঈমান না আনলে সম্ভবত তুমি এদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে ও আক্ষেপ করতে করতে মারা যাবে।" (৬ আয়াত)

আবার সূরা ফাতের–এ বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ "তাদের অবস্থার প্রতি দুঃখ ও আক্ষেপ করে যেন তোমার প্রাণ ধ্বংস না হয়ে যায়।" (৮ আয়াত) এ থেকে সে যুগে নিজের জাতির পথভ্রষ্টতা, তার নৈতিক অবক্ষয় ও গোয়ার্তুমি শুধরানোর জন্য তাঁর সকল প্রচেষ্টার প্রবল বিরোধিতা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন হৃদয়বিদারক ও কষ্টকর অবস্থায় তাঁর দিবারাত্র অতিবাহিত করতেন তা আন্দাজ করা যায়। بخع শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, পুরোপুরি জবেহ করা। بَاخِعٌ نَّفْسَكَ এর আভিধানিক অর্থ হয়, তুমি নিজেই নিজেকে হত্যা করে ফেলছো।

৩. অর্থাৎ এমন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা যার ফলে সমগ্র কাফেরকুল ঈমান ও আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়, এটা আল্লাহর জন্য কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না। যদি তিনি এমনটি না করে থাকেন তাহলে তার কারণ এ নয় যে, এ কাজটি তাঁর শক্তির বাইরে বরং এর কারণ হচ্ছে, এভাবে জোরপূর্বক ঈমান আদায় করে নিতে তিনি চান না। তিনি চান লোকেরা বুদ্ধি–বিবেক ব্যবহার করে এমন সব আয়াতের মাধ্যমে সত্যকে চিনে নিক, যেগুলো আল্লাহর কিতাবে পেশ করা হয়েছে, যেগুলো সমগ্র বিশ্ব জগতে চারদিকে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে রয়েছে এবং যেগুলো তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেই বিরাজিত রয়েছে। তারপর যখন তাদের অন্তর এ মর্মে সাক্ষ দেবে যে, নবীগণ যা পেশ করেছেন তাই যথার্থ সত্য এবং তার বিরুদ্ধে যেসব আকীদা–বিশ্বাস ও পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে তা মিথ্যা, তখন তারা জেনে বুঝে মিথ্যা ত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ করবে। আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে এ স্বেচ্ছাকৃত ঈমান, মিথ্যা পরিহার ও সত্য অনুসৃতিই চান। এ জন্য তিনি মানুষকে ইচ্ছা ও সংকল্পের স্বাধীনতা দান করেছেন। এ জন্যই তিনি মানুষকে সঠিক–বেঠিক যে পথেই সে যেতে চায় সে পথে চলার স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ জন্যই তিনি মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় প্রবণতাই রেখে দিয়েছেন। অশ্লীলতা ও তাকওয়া উভয় পথই তার সামনে খুলে দিয়েছেন। শয়তানকে পথভ্রষ্ট করার স্বাধীনতা দান করেছেন।

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبٰؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞

তাদের কাছে দয়াময়ের পক্ষ থেকে যে নতুন নসীহতই আসে, তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। এখন যখন তারা মিথ্যা আরোপ করেছে, তখন তারা যে জিনিসের প্রতি বিদ্রূপ করে চলেছে, অচিরেই তার প্রকৃত স্বরূপ (বিভিন্ন পদ্ধতিতে) তারা অবগত হবে।[4]

সঠিক পথ দেখাবার জন্য নবুওয়াত, অহী ও কল্যাণের প্রতি আহবানের ধারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পথ বাছাই করে নেবার জন্য মানুষকে সময়োপযোগী যাবতীয় যোগ্যতা দিয়ে তাকে পরীক্ষার স্থলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন—সে চাইলে কুফরী ও ফাসেকীর পথ অথবা ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করতে পারে। যদি আল্লাহ এমন কোন কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যা মানুষকে ঈমান আনতে ও আনুগত্য করতে বাধ্য করে দেয়, তাহলে এ পরীক্ষার সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। বাধ্যতামূলক ঈমানই যদি কাংখিত হতো, তাহলে নিদর্শন অবতীর্ণ করার কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ মানুষকে এমন প্রকৃতি ও কাঠামোয় সৃষ্টি করতে পারতেন যেখানে কুফরী, নাফরমানী ও অসৎকর্মের কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। বরং ফেরেশতাদের মতো মানুষও জন্মগত বিশ্বস্ত ও অনুগত হতো। কুরআন মজীদের বিভিন্নস্থানে এ সত্যটির প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ط اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ○

"যদি তোমার রব চাইতেন, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমান আনতো। এখন তুমি কি লোকদের ঈমান আনতে বাধ্য করবে?" (ইউনুস ৯৯ আয়াত)

আরো বলা হয়েছে :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۙ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ط وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ط

"যদি তোমার রব চাইতেন, তাহলে সমস্ত মানুষকে একই উম্মতে পরিণত করে দিতে পারতেন। তারা তো বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে এবং একমাত্র তারাই পথভ্রষ্ট হবে না যাদের প্রতি রয়েছে তোমার রবের অনুগ্রহ, এ জন্যই তো তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন।" (হূদ, ১১৮ ও ১১৯ আয়াত)

(আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস ১০১ ও ১০২ এবং সূরা হূদ ১১৬ টীকা)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

আর তারা কি কখনো পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি? আমি কত রকমের কত বিপুল পরিমাণ উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ তার মধ্যে সৃষ্টি করেছি? নিশ্চয়ই তার মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে,[৫] কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। আর যথার্থই তোমার রব পরাক্রান্তও এবং অনুগ্রহশীলও।[৬]

৪. অর্থাৎ যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যুক্তিসহকারে তাদেরকে কিছু বুঝাবার ও সঠিক পথ দেখাবার যে কোন চেষ্টাই করা হলে তারা প্রত্যাখ্যান ও অনাগ্রহের মাধ্যমে তার জবাব দেয়, তাদের অন্তরে জোরপূর্বক ঈমান স্থাপন করার জন্য আকাশ থেকে নিদর্শন অবতীর্ণ করে তাদের চিকিৎসা করা যায় না বরং এ ধরনের লোকদের যখন একদিকে পুরোপুরি বুঝানো হয়ে গিয়ে থাকে এবং অন্যদিকে তারা প্রত্যাখ্যানের পর্যায় অতিক্রম করে চূড়ান্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা আরোপ করতে এবং সেখান থেকেও অগ্রসর হয়ে প্রকৃত সত্যের প্রতি বিদ্রূপ করতে শুরু করে তখন তাদের অশুভ পরিণাম দেখিয়ে দেয়াই উচিত। এ অশুভ পরিণাম তাদেরকে এভাবেও দেখানো যেতে পারে যে, দুনিয়ায় যে সত্যের প্রতি তারা বিদ্রূপ করতো তাদের সকল বাধা–বিপত্তি উপেক্ষা করে তা বিজয় লাভ করবে। এ পরিণাম এভাবেও দেখানো যেতে পারে যে, তাদের ওপর একটি যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল হবে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। এ পরিণাম এভাবেও তাদের সামনে আসতে পারে যে, কয়েক বছর নিজেদের ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত থাকার পর তারা অনিবার্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে এবং অবশেষে তাদের কাছে একথা প্রমাণ হয়ে যাবে যে, যে পথে তারা নিজেদের জীবনের সমস্ত পুঁজি নিয়োগ করেছিল সেটি ছিল পুরোপুরি মিথ্যা এবং নবীগণ যে পথ পেশ করতেন এবং যার প্রতি তারা সারা জীবন ঠাট্টা–বিদ্রূপ করে এসেছে। সেটিই ছিল সত্য। এ অশুভ পরিণাম সামনে আসার যেহেতু অনেকগুলো পথ ছিল এবং বিভিন্ন লোকের সামনে তা বিভিন্ন আকারে আসতে পারে এবং চিরকালই এসেছে। তাই আয়াতে একবচনে نبأ এর পরিবর্তে বহুবচনে انباء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ যে জিনিসের প্রতি এরা বিদ্রূপ করছে তার প্রকৃত অবস্থা বিভিন্ন আকারে তারা জানতে পারবে।

৫. অর্থাৎ সত্যের অনুসন্ধানের জন্য কারো নিদর্শনের প্রয়োজন হলে তার দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। এ পৃথিবীর শ্যামল প্রকৃতির প্রতি একবার চোখ মেলে দেখুক। সে জানতে পারবে, বিশ্ব ব্যবস্থার যে স্বরূপ নবীগণ পেশ করেন (অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব) এবং মুশরিক বা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারীরা যে মতবাদ পেশ করে তার মধ্যে কোন্‌টি সঠিক। পৃথিবীর মাটিতে যেসব রকমারি জিনিস যে বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে, যেসব উপাদান

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾

২ রুকূ'

তাদেরকে সে সময়ের কথা শুনাও যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বলেছিলেন,[৭] "জালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও—ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে[৮]—তারা কি ভয় করে না?"[৯]

ও শক্তির বদৌলতে উৎপন্ন হচ্ছে, যেসব নিয়মের আওতায় উৎপাদিত হচ্ছে, তারপর তাদের বৈশিষ্ট ও গুণাবলীতে এবং অসংখ্য সৃষ্টির অসংখ্য প্রয়োজনের মধ্যে যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান, সেসব জিনিস দেখে কেবলমাত্র একজন নির্বোধই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে যে, এসব কিছু কোন মহাকৌশলীর কৌশল, কোন জ্ঞানীর জ্ঞান, কোন শক্তিমানের শক্তি এবং কোন স্রষ্টার সৃষ্টি পরিকল্পনা ছাড়া শুধুমাত্র এমনিই আপনাআপনি হচ্ছে, অথবা কোন একজন খোদা এ সমগ্র পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা করছেন না বরং বহু খোদার কৌশল ও ব্যবস্থাপনাই পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র এবং বায়ু ও পানির মধ্যে এ সামঞ্জস্য এবং এসব উপাদান থেকে সৃষ্ট উদ্ভিদ ও বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য প্রাণীর প্রয়োজনের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে রেখেছে। একজন বিবেক-বুদ্ধিমান মানুষ, সে যদি কোন প্রকার হঠকারী ও পূর্ব-বিদ্বেষ পোষণকারী না হয়ে থাকে, তাহলে এ দৃশ্য দেখে স্বতস্ফূর্তভাবে এই বলে চিৎকার করে উঠবে, নিশ্চয়ই এগুলো আল্লাহর অস্তিত্বের এবং এক ও একক আল্লাহর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট আলামত। এসব নিদর্শন থাকতে আবার কোন্ ধরনের মু'জিযার প্রয়োজন, যা না দেখলে মানুষ তাওহীদের সত্যতায় বিশ্বাস করতে পারে না?

৬. অর্থাৎ তিনি এমন শক্তিধর যে, যদি কাউকে শাস্তি দিতে চান, তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই ধ্বংস করে দেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও শাস্তি দেবার ব্যাপারে তিনি কখনো তাড়াহুড়ো করেন না, এটা তাঁর দয়ার মূর্ত প্রকাশ। বছরের পর বছর এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধরে ঢিল দিতে থাকেন। চিন্তা করার, বুঝার ও সামলে নেবার সুযোগ দিয়ে যেতে থাকেন। সারা জীবনের সমস্ত নাফরমানী একটিমাত্র তাওবায় মাফ করে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

৭. ভূমিকার আকারে ওপরের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর এবার ঐতিহাসিক বর্ণনার সূচনা হচ্ছে। হযরত মূসা ও ফেরাউনের কাহিনী দিয়ে এ বর্ণনার শুরু। এর মাধ্যমে বিশেষভাবে যে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য তা নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত হযরত মূসাকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব অবস্থার মুখোমুখি ছিলেন তার তুলনায় ছিল অনেক বেশী কঠিন। হযরত মূসা ছিলেন একটি দাস জাতির সদস্য। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এ জাতিকে মারাত্মকভাবে দাবিয়ে রেখেছিল। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ছিলেন কুরাইশ সম্প্রদায়ের সদস্য। তাঁর বংশ ও পরিবার কুরাইশদের অন্যান্য বংশ ও পরিবারের সাথে পুরোপুরি সমান মর্যদায় অবস্থান করছিল। হযরত মূসা নিজেই সেই ফেরাউনের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং একটি হত্যা অভিযোগে দশ বছর আত্মগোপন করে থাকার পর তাঁকে আবার সেই বাদশাহর দরবারে গিয়ে দাঁড়াবার হুকুম দেয়া হয়েছিল যার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের কোন নাজুক অবস্থার মুখোমুখি হননি। তাছাড়া ফেরাউনের সাম্রাজ্য ছিল সে সময় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তিশালী সাম্রাজ্য। তার সাথে কুরাইশদের শক্তির কোন তুলনাই ছিল না। এ সত্বেও ফেরাউন হযরত মূসার কোন ক্ষতিই করতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে আল্লাহ কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের এ শিক্ষা দিতে চান যে, আল্লাহ যার পৃষ্ঠপোষক থাকেন তার সাথে মোকাবিলা করে কেউ জিততে পারে না। ফেরাউনই যখন মূসার মোকাবিলায় কিছুই করতে পারেনি তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলায় তোমাদের জয়লাভের কথা কল্পনাই করা যায় না।

দ্বিতীয়ত হযরত মূসার মাধ্যমে ফেরাউনকে যেসব নিদর্শন দেখানো হয়েছে তার চেয়ে বেশী সুস্পষ্ট নিদর্শন আর কী হতে পারে? তারপর হাজার হাজার লোকের সমাবেশে ফেরাউনেরই চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে যাদুকরদের সাথে মোকাবিলা করে একথা প্রমাণও করে দেয়া হয়েছে যে, হযরত মূসা যাকিছু দেখাচ্ছেন তা যাদু নয়। যেসব যাদুশিল্প বিশেষজ্ঞগণ ফেরাউনের নিজের সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং যাদেরকে ফেরাউন নিজেই ডেকেছিল, তারা নিজেরাই এ সত্য স্বীকার করে নিয়েছে যে, হযরত মূসার লাঠি যে অজগরে পরিণত হয়েছিল, সে ব্যাপারটি ছিল যথার্থ ও অকৃত্রিম এবং শুধুমাত্র আল্লাহর মু'জিযার মাধ্যমেই এমনটি হতে পারে, যাদুর সাহায্যে এমনটি হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যাদুকররা ঈমান এনে এবং নিজেদের প্রাণকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশই রাখেনি যে, হযরত মূসার পেশকৃত নিদর্শন সত্যিই মু'জিযা, যাদু নয়। কিন্তু এ ব্যাপারেও যারা হঠকারিতায় লিপ্ত ছিল তারা নবীর সত্যতা স্বীকার করেনি। এখন তোমরা কেমন করে একথা বলতে পারো যে, তোমাদের ঈমান আনা আসলে কোন ইন্দ্রিয়ানুভূত মু'জিযা ও বস্তুগত নিদর্শন দেখার ওপর নির্ভরশীল? জাতীয় ও বংশগত স্বার্থ, জাহেলী বিদ্বেষ ও স্বার্থপূজার উর্ধে উঠে মানুষ খোলা মনে হক ও বাতিলের পার্থক্য অনুধাবন করে অসত্য কথা পরিহার করে সত্য ও সঠিক কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলে এ কিতাবে, এ কিতাব উপস্থাপনকারীর জীবনে এবং আল্লাহর বিশাল বিশ্ব–জগতে প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সর্বক্ষণ যেসব নিদর্শন দেখতে পারে তাই তার জন্য যথেষ্ট হয়। নয়তো এমন একজন হঠকারী ব্যক্তি যে সত্যের সন্ধান করে না এবং প্রবৃত্তির স্বার্থ পূজায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যে তার স্বার্থে আঘাত লাগে এমন কোন সত্য গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়, সে যতই নিদর্শন দেখুক না কেন তার সামনে আকাশ ও পৃথিবী উল্টে দিলেও সে ঈমান আনবে না।

তৃতীয়ত এ হঠকারিতার যে পরিণাম ফেরাউন দেখেছে তা এমন কোন পরিণাম নয় যা দেখার জন্য অন্য লোকেরা পাগল হয়ে গেছে। নিজের চোখে আল্লাহর শক্তিমত্তার নিদর্শন দেখে নেবার পর যে তা মানে না সে এমনি ধরনের পরিণতিরই সম্মুখীন হয়। এখন তোমরা কি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে এর স্বাদ আস্বাদন করা পছন্দ করছো?

قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِـَٔايَٰتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾

সে বললো, " হে আমার রব! আমার ভয় হয় তারা আমাকে মিথ্যা বলবে, আমার বক্ষ সংকুচিত হচ্ছে এবং আমার জিহবা সঞ্চালিত হচ্ছে না। আপনি হারুনের প্রতি রিসালাত পাঠান।[১০] আর আমার বিরুদ্ধে তো তাদের একটি অভিযোগও আছে। তাই আমার আশংকা হয় তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।"[১১] আল্লাহ বললেন, "কখ্খনো না, তোমরা দু'জন যাও আমার নিদর্শনগুলো নিয়ে,[১২] আমি তোমাদের সাথে সবকিছু শুনতে থাকবো।

তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ ১০৩ থেকে ১৩৭, সূরা ইউনুস ৭৫ থেকে ৯২, সূরা বনী ইসরাঈল ১০১ থেকে ১০৪ এবং সূরা তা–হা ৯ থেকে ৭৯ আয়াত।

৮. এ বর্ণনাভংগী ফেরাউনের সম্প্রদায়ের চরম নির্যাতনের কথা প্রকাশ করছে। "জালেম সম্প্রদায়" হিসেবে তাদেরকে পরিচিত করানো হচ্ছে। যেন তাদের আসল নামই হচ্ছে জালেম সম্প্রদায় এবং ফেরাউনের সম্প্রদায় হচ্ছে তার তরজমা ও ব্যাখ্যা।

৯. অর্থাৎ হে মূসা! দেখো কেমন অদ্ভূত ব্যাপার, এরা নিজেদেরকে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করে দুনিয়ায় জুলুম–নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে এবং ওপরে আল্লাহ আছেন, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এ ভয় তাদের নেই।

১০. সূরা তা–হা–এর ২ এবং সূরা কাসাস–এর ৪ রুকূ'তে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সেই আলোচনাগুলোকে এর সাথে মিলিয়ে দেখলে জানা যায়, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রথমত এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজে একাকী যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। (আমার বক্ষ সংকুচিত হচ্ছে বাক্যটি একথাই প্রকাশ করছে) দ্বিতীয়ত তাঁর মধ্যে এ অনুভূতি ছিল, তিনি বাকপটু নন এবং অনর্গল ও দ্রুত কথা বলার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই তিনি হযরত হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে নবী বানিয়ে তাঁর সাথে পাঠাবার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন জানান। কারণ হযরত হারুন অত্যন্ত বাকপটু, প্রয়োজনে তিনি হযরত মূসাকে সমর্থন দেবেন এবং তাঁর বক্তব্যকে সত্য প্রমাণ করে তাঁর হাত শক্তিশালী করবেন। হতে পারে, প্রথম দিকে হযরত মূসা তাঁর পরিবর্তে হযরত হারুনকে এ দায়িত্বে নিযুক্ত করার আবেদন জানান, কিন্তু পরে যখন তিনি অনুভব করেন আল্লাহ তাঁকেই নিযুক্ত করতে চান তখন আবার তাঁকে নিজের সাহায্যকারী করার আবেদন জানান। এ সন্দেহ হবার কারণ হচ্ছে, হযরত মূসা এখানে তাঁকে সাহায্যকারী করার আবেদন জানাচ্ছেন না বরং বলছেন : فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ "আপনি হারুনের কাছে রিসালাত পাঠান।" আর সূরা তা–হা–এ তিনি আবেদন জানান :

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَّلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩﴾

ফেরাউনের কাছে যাও এবং তাকে বলো, রব্বুল আলামীন আমাদের পাঠিয়েছেন যাতে তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও সে জন্য।"[১৩]

ফেরাউন বললো, "আমরা কি তোমাকে আমাদের এখানে প্রতিপালন করিনি যখন ছোট্ট শিশুটি ছিলে?[১৪] তুমি নিজের জীবনের বেশ ক'টি বছর আমাদের এখানে কাটিয়েছো এবং তারপর তুমি যে কর্মটি করেছ তাতো করেছোই[১৫] তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ।"

وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هٰرُونَ أَخِي

"আমার জন্য আমার পরিবার থেকে একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দিন, আমার ভাই হারুনকে।"

এ ছাড়া সূরা কাসাসে তিনি আবেদন জানান ঃ

وَأَخِي هٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْأً يُّصَدِّقُنِي –

"আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বেশী বাকপটু, কাজেই আপনি তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে আমার সত্যতা প্রমাণ করে।"

এ থেকে মনে হয়, সম্ভবত এই পরবর্তী আবেদন দু'টি পরে করা হয়েছিল এবং এ সূরায় হযরত মূসা থেকে যে কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে সেটিই ছিল প্রথম কথা।

বাইবেলের বর্ণনা এ থেকে ভিন্ন। বাইবেল বলছে, ফেরাউনের জাতি তাকে মিথ্যুক বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এ ভয় এবং নিজের কণ্ঠের জড়তার ওজর পেশ করে হযরত মূসা এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পুরোপুরি অস্বীকারই করে দিয়েছিলেন ঃ " হে প্রভু, বিনয় করি, অন্য যাহার হাতে পাঠাইতে চাও, এ বার্তা পাঠাও।" তারপর আল্লাহ নিজেই হযরত হারুনকে তাঁর জন্য সাহায্যকারী নিযুক্ত করে তাঁকে এ মর্মে রাজী করান যে, তাঁরা দু'ভাই মিলে ফেরাউনের কাছে যাবেন। (যাত্রা পুস্তক ৪ঃ১–১৭) আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা তা–হা, ১৯ টীকা।

১১. সূরা কাসাসের ২ রুকূ'তে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। হযরত মূসা ফেরাউনের সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে একজন ইসরাঈলীর সাথে

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّآلِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَآءِيلَ ﴿٢٢﴾

মূসা জবাব দিল, "সে সময় অজ্ঞতার মধ্যে আমি সে কাজ করেছিলাম।[১৬] তারপর তোমাদের ভয়ে আমি পালিয়ে গেলাম। এরপর আমার রব আমাকে "হুকুম" দান করলেন[১৭] এবং আমাকে রসূলদের অন্তরভুক্ত করে নিলেন। আর তোমার অনুগ্রহের কথা যা তুমি আমার প্রতি দেখিয়েছো, তার আসল কথা হচ্ছে এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছিলে।"[১৮]

লড়তে দেখে একটি ঘুঁষি মেরেছিলেন। এতে সে মারা গিয়েছিল। তারপর হযরত মূসা যখন জানতে পারলেন, এ ঘটনার খবর ফেরাউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা জানতে পেরেছে এবং তারা প্রতিশোধ নেবার প্রস্তুতি চালাচ্ছে তখন তিনি দেশ ছেড়ে মাদ্‌য়ানের দিকে পালিয়ে গেলেন। এখানে আট–দশ বছর আত্মগোপন করে থাকার পর যখন তাঁকে হুকুম দেয়া হলো তুমি রিসালাতের বার্তা নিয়ে সেই ফেরাউনের দরবারে চলে যাও, যার ওখানে আগে থেকেই তোমার বিরুদ্ধে হত্যার মামলা ঝুলছে, তখন যথার্থই হযরত মূসা আশংকা করলেন, বার্তা শুনাবার সুযোগ আসার আগেই তারা তাঁকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করে ফেলবে।

১২. নিদর্শনাদি বলতে এখানে লাঠি ও সাদা হাতের কথা বলা হয়েছে। সূরা আ'রাফ ১৩, ১৪, তা–হা ১, নামল ১ ও কাসাসের ৪ রুকূ'তে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

১৩. হযরত মূসা ও হারুনের দাওয়াতের দু'টি অংশ ছিল। একটি ছিল ফেরাউনকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহবান করা। সকল নবীর দাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এটিই। দ্বিতীয়টি ছিল বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের গোলামীর বন্ধন মুক্ত করা। এটি ছিল বিশেষভাবে কেবলমাত্র তাঁদের দু'জনেরই আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত দায়িত্ব। কুরআন মজীদে কোথাও শুধুমাত্র প্রথম অংশটির উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন সূরা নাযি'আতে) আবার কোথাও শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশটির।

১৪. এ থেকে হযরত মূসা যে ফেরাউনের গৃহে লালিত পালিত হয়েছিলেন, এ ফেরাউন যে সে ব্যক্তি নয়, এ চিন্তার প্রতি সমর্থন মেলে। বরং এ ফেরাউন ছিল তার পুত্র। এ যদি সে ফেরাউন হতো, তাহলে বলতো, আমি তোকে লালন–পালন করেছিলাম। কিন্তু এ বলছে, আমাদের এখানে তুমি ছিলে। আমরা তোমাকে লালন–পালন করেছিলাম। (এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ ৮৫–৯৩ টীকা)

১৫. হযরত মূসার মাধ্যমে যে হত্যা কার্য সংঘটিত হয়েছিল সেই ঘটনার প্রতি এখানে ইংগিত করা হয়েছে।

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

ফেরাউন বললো,[১৯] "রব্বুল আলামীন আবার কে?"[২০]

মূসা জবাব দিল, "আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রব এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যা কিছু আছে তাদেরও রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারী হও।"[২১]

ফেরাউন তার আশপাশের লোকদের বললো, "তোমরা শুনছো তো?"

মূসা বললো, " তোমাদেরও রব এবং তোমাদের বাপ–দাদাদেরও রব যারা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।"[২২]

ফেরাউন (উপস্থিত লোকদের) বললো, "তোমাদের কাছে প্রেরিত তোমাদের এ রসূল সাহেবটি তো দেখছি একেবারেই পাগল।"

মূসা বললো, "পূর্ব ও পশ্চিম এবং যা কিছু তার মাঝখানে আছে সবার রব, যদি তোমরা কিছু বুদ্ধি–জ্ঞানের অধিকারী হতে।"[২৩]

১৬. মূলে وَاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ "আমি তখন গোমরাহীর মধ্যে অবস্থান করছিলাম।" অথবা "আমি সে সময় এ কাজ করেছিলাম পথভ্রষ্ট থাকা অবস্থায়।" এ ضلالت শব্দটি অবশ্যই গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতারই সমার্থক। বরং আরবী ভাষায় এ শব্দটি অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা, ভুল, ভ্রান্তি, বিস্মৃতি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূরা কাসাসে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে এখানে ضلالت শব্দটিকে অজ্ঞতা অর্থে গ্রহণ করাই বেশী সঠিক হবে। হযরত মূসা সেই কিবতীকে একজন ইসরাঈলীর ওপর জুলুম করতে দেখে শুধুমাত্র একটি ঘুঁষি মেরেছিলেন। সবাই জানে, ঘুঁষিতে সাধারণত মানুষ মরে না। আর তিনি হত্যা করার উদ্দেশ্যেও ঘুঁষি মারেননি। ঘটনাক্রমে এতেই সে মরে গিয়েছিল। তাই সঠিক ঘটনা এ ছিল যে, এটি ইচ্ছাকৃত হত্যা ছিল না বরং ছিল ভুলক্রমে হত্যা। হত্যা নিশ্চয়ই হয়েছে কিন্তু ইচ্ছা করে হত্যা করার সংকল্প করে হত্যা করা হয়নি। হত্যা করার জন্য যেসব অস্ত্র বা উপায় ও কায়দা ব্যবহার করা

হয় অথবা যেগুলোর সাহায্যে হত্যাকার্য সংঘটিত হতে পারে তেমন কোন অস্ত্র, উপায় বা কায়দাও ব্যবহার করা হয়নি।

১৭. অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং নবুওয়াতের পরোয়ানা। "হুকুম" অর্থ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হয় আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীকে কর্তৃত্ব করার অনুমতিও (Authority) হয়। এরি ভিত্তিতে তিনি ক্ষমতা সহকারে কথা বলেন।

১৮. অর্থাৎ তোমরা যদি বনী ইসরাঈলের প্রতি জুলুম-নিপীড়ন না চালাতে তাহলে আমি প্রতিপালিত হবার জন্য তোমাদের গৃহে কেন আসতাম? তোমাদের জুলুমের কারণেই তো আমার মা আমাকে ঝুড়িতে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। নয়তো আমার লালন-পালনের জন্য কি আমার নিজের গৃহ ছিল না? তাই এ লালন-পালনের জন্য অনুগৃহীত করার খোটা দেয়া তোমার মুখে শোভা পায় না।

১৯. হযরত মূসাকে ফেরাউনের কাছে যে বাণী পৌছাবার জন্য পাঠানো হয়েছিল তিনি নিজেকে রব্বুল আলামীনের রসূল হিসেবে পেশ করে তা তাকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন, এ বিস্তারিত বিবরণটি এখানে বাদ দেয়া হয়েছে। একথা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত যে, যে বাণী পৌছিয়ে দেবার জন্য নবীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল তিনি নিশ্চয়ই তা পৌছিয়ে দিয়ে থাকবেন। তাই তা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেটি বাদ দিয়ে এবার এমন সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে যা এ বাণী প্রচারের পর ফেরাউন ও মূসার মধ্যে হয়েছিল।

২০. এ প্রশ্নটি করা হয় হযরত মূসার উক্তির ওপর ভিত্তি করে। তিনি বলেন, আমি রব্বুল আলামীনের (সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক, প্রভু ও শাসকের) পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি এবং এ জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দেবে। এটি ছিল সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, হযরত মূসা যাঁর প্রতিনিধিত্বের দাবীদার তিনি সারা বিশ্ব-জাহানের সকল সৃষ্টির ওপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসনের অধিকারী এবং তিনি ফেরাউনকে নিজের অনুগত গণ্য করে তার শাসন কর্তৃত্বের পরিসরে একজন উর্ধতন শাসনকর্তা হিসেবে কেবল হস্তক্ষেপই করছেন না বরং তার নামে এ ফরমানও পাঠাচ্ছেন যে, তোমার প্রজাদের একটি অংশকে আমার মনোনীত প্রতিনিধির হাতে সোপর্দ করো, যাতে সে তাদেরকে তোমার রাষ্ট্রসীমার বাইরে বের করে আনতে পারে। একথায় ফেরাউন জিজ্ঞেস করছে, এ সারা বিশ্ব-জাহানের মালিক ও শাসনকর্তাটি কে? যিনি মিসরের বাদশাহকে তার প্রজাকূলের অন্তরভূক্ত সামান্য এক ব্যক্তির মাধ্যমে এ ফরমান পাঠাচ্ছেন?

২১. অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে বসবাসকারী কোন সৃষ্টি ও ধ্বংসশীল শাসন কর্তৃত্বের দাবীদারের পক্ষ থেকে আসিনি বরং এসেছি আকাশ ও পৃথিবীর মালিকের পক্ষ থেকে। যদি তোমরা বিশ্বাস করো এ বিশ্ব-জাহানের কোন স্রষ্টা-মালিক ও শাসনকর্তা আছেন তাহলে বিশ্ববাসীর রব কে একথা বুঝা তোমাদের পক্ষে কঠিন হবার কথা নয়।

২২. হযরত মূসা (আ) ফেরাউনের দরবারীদেরকে সম্বোধন করে এ ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ফেরাউন বলেছিল, তোমরা শুনছো? হযরত মূসা তাদেরকে বলেন, আমি এমন সব মিথ্যা রবের প্রবক্তা নই যারা আজ আছে, কাল ছিল না এবং কাল ছিল কিন্তু আজ নেই। তোমাদের এ ফেরাউন যে আজ তোমাদের রবে পরিণত হয়েছে সে

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾ قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

ফেরাউন বললো, "যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বলে মেনে নাও, তাহলে কারাগারে যারা পচে মরছে তোমাকেও তাদের দলে ভিড়িয়ে দেবো।"২৪

মূসা বললো, "আমি যদি তোমার সামনে একটি সুস্পষ্ট জিনিস আনি তবুও?"২৫

ফেরাউন বললো, " বেশ, তুমি আনো যদি তুমি সত্যবাদী হও।"২৬

কাল ছিল না এবং কাল তোমাদের বাপ–দাদারা যেসব ফেরাউনকে রবে পরিণত করেছিল তারা আজ নেই। আমি কেবলমাত্র সেই রবের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসনাধিকার স্বীকার করি যিনি আজও তোমাদের এবং এই ফেরাউনের রব এবং এর পূর্বে তোমাদের ও এর যে বাপ–দাদারা চলে গেছেন তাদের সবারও রব ছিলেন।

২৩. অর্থাৎ আমাকে পাগল গণ্য করা হচ্ছে। কিন্তু আপনারা যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন, তাহলে নিজেরাই ভেবে দেখুন, প্রকৃতপক্ষে কি এ বেচারা ফেরাউন যে পৃথিবীর সামান্য একটু ভূখণ্ডের বাদশাহ হয়ে বসেছে সে রব? অথবা পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক এবং মিসরসহ পূর্ব ও পশ্চিম দ্বারা পরিব্যাপ্ত প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক যিনি তিনি রব? আমি তো তাঁরই শাসন কর্তৃত্ব মানি এবং তাঁরই পক্ষ থেকে এ হুকুম তাঁর এক বান্দার কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।

২৪. এ কথোপকথনটি বুঝতে হলে এ বিষয়টি সামনে থাকতে হবে যে, আজকের মতো প্রাচীন যুগেও "উপাস্য"–এর ধারণা কেবলমাত্র ধর্মীয় অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ উপাস্য শুধুমাত্র পূজা, আরাধনা, মানত ও নযরানা লাভের অধিকারী। তার অতি প্রাকৃতিক প্রাধান্য ও কর্তৃত্বের কারণে মানুষ নিজের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে তার কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের জন্য প্রার্থনা করবে, এ মর্যাদাও তার আছে। কিন্তু কোন উপাস্য আইনগত ও রাজনৈতিক দিক দিয়েও প্রাধান্য বিস্তার করার এবং পার্থিব বিষয়াদিতে তার ইচ্ছামতো যে কোন হুকুম দেবে আর তার বিধি–নিষেধকে উচ্চতর আইন হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তার সামনে মানুষকে মাথা নত করতে হবে। এ কথা পৃথিবীর ভুয়া শাসনকর্তারা আগেও কখনো মেনে নেয়নি এবং আজো মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা সবসময় একথা বলে এসেছে, দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যাপারে আমরা পূর্ণ স্বাধীন। কোন উপাস্যের আমাদের রাজনীতিতে ও আইনে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। এটিই ছিল পার্থিব রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যসমূহের সাথে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও

তাঁদের অনুসারী সংস্কারকদের সংঘাতের আসল কারণ। তাঁরা এদের কাছ থেকে সমগ্র বিশ্ব–জাহানের মালিক আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করেছেন এবং এরা এর জবাবে যে কেবলমাত্র নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের দাবী পেশ করতে থেকেছে তাই নয় বরং এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরাধী ও বিদ্রোহী গণ্য করেছে, যে তাদের ছাড়া অন্য কাউকে আইন ও রাজনীতির ময়দানে উপাস্য হিসেবে মেনে নিয়েছে। এ ব্যাখ্যা থেকে ফেরাউনের এ কথাবার্তার সঠিক মর্ম ভালোভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। যদি কেবলমাত্র পূজা–অর্চনা ও নযরানা–মানত পেশ করার ব্যাপার হতো, তাহলে হযরত মূসা অন্য দেবতাদের বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে এর হকদার মনে করেন এটা তার কাছে কোন আলোচনার বিষয়ই হতো না। যদি কেবলমাত্র এ অর্থেই মূসা আলাইহিস সালাম তাকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাওহীদমুখী হবার দাওয়াত দিতেন তাহলে তার ক্রোধোন্মত্ত হবার কোন কারণই ছিল না। বড়জোর সে যদি কিছু করতো তাহলে নিজের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করতো অথবা হযরত মূসাকে বলতো, আমার ধর্মের পণ্ডিতদের সাথে বিতর্ক করে নাও। কিন্তু যে জিনিসটি তাঁকে ক্রোধোন্মত্ত করে দিয়েছে সেটি ছিল এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে পেশ করে তাকে এমনভাবে একটি রাজনৈতিক হুকুম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন যেন সে একজন অধীনস্থ শাসক এবং একজন উর্ধতন শাসনকর্তার দূত এসে তার কাছে এ হুকুমের প্রতি আনুগত্য করার দাবী করছেন। এ অর্থে সে নিজের ওপর কোন রাজনৈতিক ও আইনগত প্রাধান্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বরং তার কোন প্রজা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে উর্ধতন শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নেবে, এটাও সে বরদাশত করতে পারতো না। তাই সে প্রথমে চ্যালেঞ্জ করলো "রব্বুল আলামীনে"র পরিভাষাকে। কারণ তাঁর পক্ষ থেকে যে বার্তা নিয়ে আসা হয়েছিল তার মধ্যে শুধুমাত্র ধর্মীয় উপাসনার নয় বরং সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ভাবধারা সুস্পষ্ট ছিল। তারপর হযরত মূসা যখন বারবার ব্যাখ্যা করে বললেন, তিনি যে রব্বুল আলামীনের বার্তা এনেছেন তিনি কে? তখন সে পরিষ্কার হুমকি দিল, মিসর দেশে তুমি যদি আমার ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌম কর্তৃত্বের নাম উচ্চারণ করবে তাহলে তোমাকে জেলখানার ভাত খেতে হবে।

২৫. অর্থাৎ যদি আমি সত্যিই সমগ্র বিশ্ব–জাহানের, আকাশ ও পৃথিবীর এবং পূর্ব ও পশ্চিমের রবের পক্ষ থেকে যে আমাকে পাঠানো হয়েছে এর সপক্ষে সুস্পষ্ট আলামত পেশ করি, তাহলে এ অবস্থায়ও কি আমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করা হবে এবং আমাকে কারাগারে পাঠানো হবে?

২৬. হযরত মূসার প্রশ্নের জবাবে ফেরাউনের এ উক্তি স্বতষ্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে যে, প্রাচীন ও আধুনিক কালের মুশরিকদের থেকে তার অবস্থা ভিন্নতর ছিল না। অন্য সব মুশরিকদের মতোই সে আল্লাহকে অতিপ্রাকৃত অর্থে সকল উপাস্যের উপাস্য বলে বিশ্বাস করতো এবং তাদের মতো একথাও স্বীকার করতো যে, বিশ্ব-জাহানে সকল দেবতার চাইতে

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّـٰظِرِينَ ﴿٣٣﴾

(তার মুখ থেকে একথা বের হতেই) মূসা নিজের লাঠিটি ছুড়ে মারলো। তৎক্ষণাৎ সেটি হলো একটি সাক্ষাত অজগর।[২৭] *তারপর সে নিজের হাত (বগলের ভেতর থেকে) টেনে বের করলো এবং তা সকল প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে চক্‌মক্ করছিল।*[২৮]

তাঁর শক্তি বেশী। তাই হযরত মূসা তাঁকে বলেন, যদি তুমি আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত বলে বিশ্বাস না করো, তাহলে আমি এমন সব নিদর্শন পেশ করবো যা থেকে আমি যে তাঁর প্রেরিত তা প্রমাণ হয়ে যাবে। আর এ কারণেই সে–ও জবাব দেয়, ঠিক আছে যদি তোমার দাবী সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আনো তোমার নিদর্শন। অন্যথায় সোজা কথা, যদি সে আল্লাহর অস্তিত্ব অথবা তাঁর বিশ্ব–জাহানের মালিক হবার ব্যাপারেই সন্দিহান হতো, তাহলে নিদর্শনের প্রশ্নই উঠতে পারতো না। নিদর্শনের প্রশ্ন তো তখনই সামনে আসতে পারে যখন আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হওয়া স্বীকৃত হয় কিন্তু হযরত মূসা তাঁর প্রেরিত কি না এ ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দেয়।

২৭. কুরআন মজীদে কোন জায়গায় এ জন্য حَيَّةٌ (সাপ) আবার কোথাও جَانٌ (সাধারণত ছোট ছোট সাপকে বলা হয়) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে বলা হচ্ছে ثُعْبَانٌ (অজগর)। ইমাম রাযী এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন حية আরবী ভাষায় সর্পজাতির সাধারণ নাম। তা ছোট সাপও হতে পারে আবার বড় সাপও হতে পারে। আর ثعبان শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, দৈহিক আয়তন ও স্থূলতার দিক দিয়ে তা ছিল অজগরের মতো। অন্যদিকে جان শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ছোট সাপের মতো তার ক্ষীপ্রতা ও তেজস্বীতার জন্য।

২৮. কোন কোন তাফসীরকার ইহুদীদের বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে بيضاء এর অর্থ করেছেন "সাদা" এবং এর অর্থ এভাবে নিয়েছেন, বগল থেকে বের হতেই স্বাভাবিক রোগমুক্ত হাত ধবল কুষ্ঠরোগীর মতো সাদা হয়ে গেলো? কিন্তু ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর, যামাখ্শারী, রাযী, আবুস সাউদ ঈমাদী, আলূসী ও অন্যান্য বড় বড় মুফাস্সিরগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এখানে بيضاء মানে হচ্ছে, উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়। যখনই হযরত মূসা বগল থেকে হাত বের করলেন তখনই অকস্মাত সমগ্র পরিবেশ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং অনুভূত হতে লাগলো যেন সূর্য উদিত হয়েছে।

(আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা তা–হা, ১৩ টীকা)।

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

৩ রুকূ'

ফেরাউন তার চারপাশে উপস্থিত সরদারদেরকে বললো, "এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন দক্ষ যাদুকর। নিজের যাদুর জোরে সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়।[২৯] এখন বলো তোমরা কী হুকুম দিচ্ছো?"[৩০]

তারা বললো, "তাকে ও তার ভাইকে আটক করো এবং শহরে শহরে হরকরা পাঠাও। তারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে তোমার কাছে নিয়ে আসুক।"

তাই একদিন নির্দিষ্ট সময়ে[৩১] যাদুকরদেরকে একত্র করা হলো।

২৯. মু'জিযা দু'টির শ্রেষ্ঠত্ব এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। মাত্র এক মুহূর্ত আগে নিজের এক সাধারণ প্রজাকে দরবারের মধ্যে রিসালাতের কথাবার্তা ও বনী ইসরাঈলের মুক্তির দাবী করতে দেখে ফেরাউন তাকে পাগল ঠাউরিয়েছিল। (কারণ তার দৃষ্টিতে একটি গোলাম জাতির কোন ব্যক্তির পক্ষে তার মতো পরাক্রমশালী বাদশাহর সামনে এ ধরনের দুসাহস করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।) এবং এই বলে ধমক দিচ্ছিল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে মেনে নাও, তাহলে তোমাকে কারাগারে আটকে মারবো। আর এখন মাত্র এক মুহূর্ত পরে এ নিদর্শনগুলো দেখার সাথে সাথেই তার মধ্যে এমন ভীতির সঞ্চার হলো যে, নিজের বাদশাহী ও রাজ্য হারাবার ভয়ে সে ভীত হয়ে পড়লো এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রকাশ্য দরবারে নিজের অধস্তন কর্মচারীদের সামনে সে যে কেমন অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে চলছে সে অনুভূতিই সে হারিয়ে ফেললো। বনী ইসরাঈলের মতো একটি নির্যাতিত-নিপীড়িত জাতির দু'টি লোক যুগের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী বাদশাহর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের সাথে কোন লোক-লস্কর ছিল না। তাদের জাতির মধ্যে কোন সক্রিয়তা ও প্রাণশক্তি ছিল না। দেশের কোথাও বিদ্রোহের সামান্যতম আলামতও ছিল না। দেশের বাইরের অন্য কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিও তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল না। এ অবস্থায় শুধুমাত্র একটি লাঠিকে সর্পে পরিণত হতে ও একটি হাতকে ঔজ্জ্বল্য বিকীরণ করতে দেখে অকস্মাত তার এই বলে চিৎকার করে ওঠা যে, এ দু'টি সহায়-সম্বলহীন লোক আমাকে সিংহাসনচ্যুত করবে এবং সমগ্র শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বেদখল করে দেবে—একথার কী অর্থ হতে পারে? এ ব্যক্তি যাদুবলে এসব করে ফেলবে— একথা বলাও তার অত্যধিক হতবুদ্ধি হওয়ারই

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾

এবং লোকদের বলা হলো, "তোমরাও কি সমাবেশে যাবে?[৩২] *হয়তো আমরা যাদুকরদের ধর্মের অনুসরণের ওপরই বহাল থাকবো, যদি তারা বিজয়ী হয়।"*[৩৩]

যখন যাদুকররা ময়দানে এলো, তারা ফেরাউনকে বললো, "আমরা কি পুরস্কার পাবো, যদি আমরা বিজয়ী হই?"[৩৪]

সে বললো, "হাঁ, আর তোমরা তো সে সময় নিকটবর্তীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।"[৩৫]

মূসা বললো, " তোমাদের যা নিক্ষেপ করার আছে নিক্ষেপ করো।"

প্রমাণ। যাদুবলে দুনিয়ায় কখনো কোথাও কোন রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়নি, কোন দেশ বিজিত হয়নি, কোন যুদ্ধ জয়ও হয়নি। যাদুকররা তো তার নিজের দেশেই ছিল এবং তারা বড় বড় তেলেসমাতি দেখাতে পারতো। কিন্তু সে নিজে জানতো, ভেল্কিবাজীর খেলা দেখিয়ে পুরস্কার নেয়া ছাড়া তাদের আর কোন কৃতিত্ব নেই। রাজ্য তো দূরের কথা, সে বেচারারা তো রাজ্যের একজন সামান্য পুলিশ কনস্টেবলকেও চ্যালেঞ্জ করার হিম্মত রাখতো না।

৩০. ফেরাউন যে অত্যধিক হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, এ বাক্যাংশটি সে কথাই প্রকাশ করে। সে নিজেকে উপাস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল এবং এদের সবাইকে করে রেখেছিল নিজের গোলাম। কিন্তু এখন উপাস্য সাহেব ভয়ের চোটে অস্থির হয়ে বান্দাদের কাছেই জিজ্ঞেস করছে তোমরা কি হুকুম দাও। অন্য কথায় বলা যায়, সে যেন বলতে চাচ্ছে, আমার বুদ্ধি তো এখন বিকল হয়ে গেছে, তোমরাই বলো আমি কিভাবে এ বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

৩১. সূরা তা-হা-এ উল্লেখিত হয়েছে, কিবতীদের জাতীয় ঈদের দিনকে (يوم الزينة) এ প্রতিদ্বন্দ্বীতার দিন হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে উৎসব ও মেলা উপলক্ষে আগত সমস্ত লোকেরা এ বিরাট প্রতিযোগিতা দেখতে পাবে এটাই ছিল উদ্দেশ্য। এ জন্য সময় নির্ধারিত করা হয়েছিল সূর্য আকাশে উঠে চারদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ার পর। এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে সবার চোখের সামনে উভয় পক্ষের শক্তির প্রদর্শনী হবে এবং আলোর অভাবে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবার অবকাশ থাকবে না।

৩২. অর্থাৎ শুধুমাত্র ঘোষণা ও বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করা হয়নি বরং জনগণকে উদ্দীপিত ও উত্তেজিত করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখার জন্য ময়দানে হাজির করার উদ্দেশ্যে লোকও নিয়োগ করা হয়। এ থেকে জানা যায়, প্রকাশ্য দরবারে হযরত মূসা যেসব মু'জিযা দেখিয়েছিলেন সেগুলোর খবর সাধারণ লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশের লোকেরা এতে প্রভাবিত হতে চলেছে বলে ফেরাউনের মনে আশংকা দেখা দিয়েছিল। তাই সে চাচ্ছিল বেশী বেশী জনসমাগম হোক এবং লোকেরা দেখে নিক লাঠির সাপে পরিণত হওয়া কোন বড় কথা নয়, আমাদের দেশের প্রত্যেক যাদুকরও এ ভেল্কিবাজী দেখাতে পারে।

৩৩. এ বাক্যাংশটি প্রমাণ করছে যে, ফেরাউনের দরবারের যেসব লোক হযরত মূসার মু'জিযা দেখেছিল এবং দরবারের বাইরের যেসব লোকের কাছে এর নির্ভরযোগ্য খবর পৌঁছে গিয়েছিল, নিজেদের পিতৃপুরুষের ধর্মের ওপর তাদের বিশ্বাসের ভিত্ নড়ে যাচ্ছিল এবং এখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে কাজ করেছেন তাদের যাদুকররাও কোনক্রমে তা করিয়ে দেখিয়ে দিক, এরি ওপর তাদের ধর্মের টিকে থাকা নির্ভর করছিল। ফেরাউন ও তার রাজ্যের কর্মকর্তাগণ একে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর মোকাবিলা মনে করছিল। তাদের প্রেরিত লোকেরা সাধারণ মানুষের মগজে এ চিন্তা প্রবেশ করাবার চেষ্টা করছিল যে, যাদুকররা যদি কামিয়াব হয়ে যায়, তাহলে মূসার ধর্ম গ্রহণ করার হাত থেকে আমরা বেঁচে যাবো, অন্যথায় আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের অপমৃত্যু ঘটবে।

৩৪. এ ছিল মুশরিকী ধর্মের রক্ষকদের অবস্থা। মূসা আলাইহিস সালামের হামলা থেকে তারা নিজেদের ধর্মকে বাঁচাতে চাচ্ছিল। এ জন্য চূড়ান্ত মোকাবিলার সময় তাদের মধ্যে যে পবিত্র আবেগের সঞ্চার হয়েছিল তা ছিল এই যে, তারা বাজী জিততে পারলে সরকার বাহাদুর থেকে কিছু পুরস্কার পাওয়া যাবে।

৩৫. আর এ ছিল সমকালীন বাদশাহর পক্ষ থেকে ধর্ম ও জাতির খিদমতগারদেরকে প্রদান করার মতো সবচেয়ে বড় ইনাম। অর্থাৎ কেবল টাকা পয়সাই পাওয়া যাবে না, দরবারে আসনও পাওয়া যাবে। এভাবে ফেরাউন ও তার যাদুকররা প্রথম পর্যায়েই নবী ও যাদুকরের বিরাট নৈতিক পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। একদিকে ছিল উন্নত মনোবল। বনী ইসরাঈলের মতো একটি নিগৃহীত জাতির এক ব্যক্তি দশ বছর যাবত নরহত্যার অভিযোগে আত্মগোপন করে থাকার পর ফেরাউনের দরবারে বুক টান করে এসে দাঁড়াচ্ছেন। নির্ভীক কণ্ঠে বলে যাচ্ছেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাকে পাঠিয়েছেন, বনী ইসরাঈলকে আমার হাতে সোপর্দ করে দাও। ফেরাউনের সাথে মুখোমুখি বিতর্ক করতে তিনি সামান্যতম সংকোচ অনুভব করছেন না। তার হুমকি ধমকিকে তিলার্ধও গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অন্যদিকে হীন মনোবলের প্রকাশ। বাপ-দাদার ধর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে যাদুকরদেরকে ফেরাউনের দরবারেই ডেকে পাঠানো হচ্ছে। এরপরও হাত জোড় করে তারা বলছে, জনাব! কিছু ইনাম তো মিলবে? আর জবাবে অর্থ পুরস্কার ছাড়াও রাজ নৈকট্যও লাভ করা যাবে শুনে খুশীতে বাগেবাগ। নবী কোন্ প্রকৃতির মানুষ এবং তাঁর মোকাবিলায় যাদুকররা কেমন ধরনের লোক, এ দু'টি বিপরীত চরিত্র আপনা আপনি একথা প্রকাশ করে দিচ্ছে। কোন ব্যক্তি নির্লজ্জতার সকল সীমালংঘন না করলে নবীকে যাদুকর বলার দুসাহস দেখাতে পারে না।

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾

তারা তখনই নিজেদের দড়িদড়া ও লাঠিসোঁটা নিক্ষেপ করলো এবং বললো, "ফেরাউনের ইজ্জতের কসম, আমরাই বিজয়ী হবো।"৩৬ তারপর মূসা নিজের লাঠিটি নিক্ষেপ করলো। অকস্মাত সে তাদের কৃত্রিম কীর্তিগুলো গ্রাস করতে থাকলো। তখন সকল যাদুকর স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদাবনত হয়ে পড়লো এবং বলে উঠলো, "মেনে নিলাম আমরা রব্বুল আলামীনকে — মূসা ও হারুনের রবকে।"৩৭

৩৬. এখানে এ আলোচনা বাদ দেয়া হয়েছে যে, হযরত মূসার মুখে এ বাক্য উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই যখন যাদুকররা নিজেদের দড়িদড়া ও লাঠিসোঁটা ছুঁড়ে দিল তখন অকস্মাত সেগুলোকে বহু সাপের আকারে কিলবিল করতে করতে হযরত মূসার দিকে দৌড়ে যেতে দেখা গেলো। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এর বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوْا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ

"যখন তারা নিজেদের মন্ত্র নিক্ষেপ করলো তখন লোকদের দৃষ্টিকে যাদুগ্রস্ত করে দিল, সবাইকে আতংকিত করে ফেললো এবং বিরাট যাদু বানিয়ে নিল।"

সূরা তা-হা-এ এমন এক সময়ের চিত্র আঁকা হয়েছে যখন ঃ

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعٰى ○

فَأَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ○

"সহসা তাদের যাদুর ফলে হযরত মূসার মনে হলো যেন তাদের রশি ও লাঠিগুলো দৌড়ে চলে আসছে। এতে মূসা মনে মনে ভয় পেয়ে গেলো।"

৩৭. এটা হযরত মূসার মোকাবিলায় তাদের পক্ষ থেকে নিছক পরাজয়ের স্বীকৃতি ছিল না। ব্যাপারটা এমন ছিল না যে, কেউ বলতো, আরে ছেড়ে দাও, একজন বড় যাদুকর ছোট যাদুকরদেরকে হারিয়ে দিয়েছে। বরং তাদের সিজদানত হয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনা যেন প্রকাশ্যে সর্ব সমক্ষে হাজার হাজার মিসরবাসীর সামনে একথার স্বীকৃতি ও ঘোষণা দিয়ে দেয়া যে, মূসা যা কিছু এনেছেন তা আমাদের যাদু শিল্পের অন্তরগত নয়, এ কাজ তো একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কুদরতেই হতে পারে।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۬ؕ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾

ফেরাউন বললো, "তোমরা মূসার কথা মেনে নিলে আমি তোমাদের অনুমতি দেবার আগেই! নিশ্চয়ই এ তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের যাদু শিখিয়েছে।[৩৮] বেশ, এখনই তোমরা জানবে। আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করাবো এবং তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবো।"[৩৯]

৩৮. এখানে যেহেতু বক্তব্য পরম্পরার সাথে সম্পর্ক রেখে কেবলমাত্র এতটুকু দেখানো উদ্দেশ্য যে, কোন জেদী ও হঠকারী ব্যক্তি একটি সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখার এবং তার মু'জিযা হবার সপক্ষে স্বয়ং যাদুকরদের সাক্ষ শুনার পরও কিভাবে তাকে যাদু আখ্যা দিয়ে যেতে থাকে, তাই ফেরাউনের শুধুমাত্র এতটুকু উক্তি এখানে উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু সূরা আ'রাফে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا –

"এ একটি ষড়যন্ত্র, যা তোমরা সবাই মিলে এ রাজধানী নগরে তৈরি করেছো, যাতে এর মালিকদেরকে কর্তৃত্ব থেকে বেদখল করে দাও।"

এভাবে ফেরাউন সাধারণ জনতাকে একথা বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করে যে, যাদুকরদের এ ঈমান মু'জিযার কারণে নয় বরং এটি নিছক একটি যোগসাজশ। এখানে আসার আগে মূসার সাথে এদের এ মর্মে সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল যে, এখানে এসে এরা মূসার মোকাবিলায় পরাজয় বরণ করে নেবে এবং এর ফলে যে রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হবে তার সুফল এরা উভয় গোষ্ঠী মিলে ভোগ করবে।

৩৯. যাদুকররা আসলে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে যোগসাজশ করে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল, নিজের এ অভিমতকে সফল করে তোলার জন্য ফেরাউন এ ভয়ংকর হুমকি দিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে এরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য ষড়যন্ত্র স্বীকার করে নেবে এবং এর ফলে পরাজিত হবার সাথে সাথে তাদের সিজদাবনত হয়ে ঈমান আনার ফলে হাজার হাজার দর্শকের ওপর যে নাটকীয় প্রভাব পড়েছিল তা নির্মূল হয়ে যাবে। এ দর্শকবৃন্দ স্বয়ং ফেরাউনের আমন্ত্রণে এ চূড়ান্ত মোকাবিলা উপভোগ করার জন্য সমবেত হয়েছিল। তার প্রেরিত লোকেরাই তাদেরকে এ ধারণা দিয়েছিল যে, মিসরীয় জাতির ধর্ম বিশ্বাস এখন এ যাদুকরদের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল রয়েছে। এরা সফলকাম হলে জাতি তার পূর্বপুরুষের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে, অন্যথায় মূসার দাওয়াতের সয়লাব তাকে ও তার সাথে ফেরাউনের রাজত্বকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

قَالُوا لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۞

তারা জবাব দিল, "কোন পরোয়া নেই, আমরা নিজেদের রবের কাছে পৌঁছে যাবো। আর আমরা আশা করি আমাদের রব আমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন, কেননা, সবার আগে আমরা ঈমান এনেছি।[৪০]

৪০. অর্থাৎ আমাদের একদিন তো আমাদের রবের কাছে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। এখন যদি তুমি আমাদের হত্যা করো, তাহলে এর ফলে যেদিনটি আসবার ছিল সেটি আজ এসে যাবে, এর বেশী আর কিছু হবে না। এ অবস্থায় ভয় পাওয়ার প্রশ্ন কেন উঠবে? বরং উল্টো আমাদের তো মাগফেরাত পাওয়ার ও গোনাহ মাফের আশা আছে। কারণ আজ এখানে সত্য প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই আমরা তা মেনে নেবার ক্ষেত্রে এক মুহূর্তও দেরী করিনি এবং এ বিশাল সমাবেশে আমরাই প্রথমে অগ্রবর্তী হয়ে ঈমান এনেছি।

ফেরাউন ঢেঁড়া পিটিয়ে যে জনগোষ্ঠীকে সমবেত করেছিল তাদের সবার সামনে যাদুকরদের এ জবাব দু'টি কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে ঃ

এক ঃ ফেরাউন একজন মহা মিথ্যুক, হঠকারী ও প্রতারক। সে নিজে ফায়সালা করার জন্য যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল তাতে মূসা আলাইহিস সালামের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিজয়কে সোজাভাবে মেনে নেবার পরিবর্তে এখন সে সহসা একটি মিথ্যা ষড়যন্ত্রের গল্প ফেঁদে বসেছে এবং হত্যা ও শাস্তির হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক তার স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করছে। এ গল্প যদি সামান্যও সত্য হতো, তাহলে যাদুকররা হাত-পা কাটাবার ও শূলবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দেবার জন্য এত হন্যে হয়ে যেতো না। এ ধরনের কোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যদি কোন রাজত্ব লাভের লোভ থেকে থাকতো, তাহলে এখন তো আর তার কোন অবকাশ নেই। কারণ রাজত্ব এখন যাদের ভাগ্যে আছে তারাই তা ভোগ করবে, এ ভাগ্যাহতরা তো এখন শুধুমাত্র নিহত হওয়া ও শাস্তি লাভ করার জন্য রয়ে গেছে। এ ভয়াবহ বিপদ মাথায় নিয়েও এ যাদুকরদের নিজেদের ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা পরিষ্কারভাবে একথা প্রমাণ করে যে, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। বরং এ ক্ষেত্রে সত্য কথা হচ্ছে, যাদুকররা নিজেদের যাদুবিদ্যায় পারদর্শী হবার কারণে যথার্থই জানতে পেরেছে যে, মূসা আলাইহিস সালাম যা কিছু দেখিয়েছেন তা কোনক্রমেই যাদু নয় বরং প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কুদরতের প্রকাশ।

দুই ঃ এ সময় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজার হাজার জনতার সামনে যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটি ছিল এই যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথেই এ যাদুকরদের চরিত্রে কেমন নৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়ে গেলো। ইতিপূর্বে তাদের অবস্থা ছিল ঃ তারা পূর্বপুরুষদের ধর্মকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল এবং এ জন্য ফেরাউনের সামনে হাত জোড় করে ইনাম চাইছিল। আর এখন

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۝ فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ۝ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ۝ وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ۝

৪ রুকূ'

আমি [৪১] মূসার কাছে অহী পাঠিয়েছি এই মর্মে ঃ "রাতারাতি আমার বান্দাদের নিয়ে বের হয়ে যাও, তোমাদের পিছু নেয়া হবে।"[৪২] এর ফলে ফেরাউন (সৈন্য একত্র করার জন্য) নগরে নগরে নকীব পাঠালো (এবং বলে পাঠালো ঃ) এরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক, এরা আমাদের নারাজ করেছে এবং আমরা একটি দল, সদা–সতর্ক থাকাই আমাদের রীতি।[৪৩]

মুহূর্তের মধ্যে তাদের হিম্মত ও সংকল্পের বলিষ্ঠতা এমনি উন্নত পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যার ফলে সেই ফেরাউন তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল, তার সমগ্র রাজশক্তিকে তারা হেয় প্রতিপন্ন করেছিল এবং নিজেদের ঈমানের খাতিরে মৃত্যু ও নিকৃষ্টতম শারীরিক শাস্তি বরদাশ্ত করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এ নাজুক মনস্তাত্বিক পরিবেশে মিসরীয়দের মুশরিকী ধর্মের লাঞ্ছনা এবং মূসা আলাইহিস সালাম প্রচারিত সত্য দীনের বলিষ্ঠ প্রচারণা সম্ভবত এর চাইতে বেশী আর হতে পারতো না।

৪১. ওপরে বর্ণিত ঘটনার পর হিজরতের কথা শুরু করার কারণে কারো মনে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যে, এর পরপরই হযরত মূসাকে বনী ইসরাঈলসহ মিসর থেকে বের হয়ে আসার হুকুম দেয়া হয়। আসলে এখানে মাঝখানে কয়েক বছরের ইতিহাস আলোচনা করা হয়নি। সূরা আ'রাফের ১৫-১৬ এবং সূরা ইউনুসের ৯ রুকূ'তে এ আলোচনা এসেছে। এর একটি অংশ সামনের দিকে সূরা মু'মিনের ২-৫ ও সূরা যুখরুফের ৫ রুকূ'তেও আসছে। এখানে যেহেতু বক্তব্য পরম্পরার সাথে সম্পর্ক রেখে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দেখে নেবার পরও যে ফেরাউন হঠকারিতার পথ অবলম্বন করেছিল তার পরিণতি কি হয়েছিল এবং যে দাওয়াতের পেছনে আল্লাহর শক্তি নিয়োজিত ছিল তা কিভাবে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেলো সেকথা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য, তাই ফেরাউন ও হযরত মূসার সংঘাতের প্রাথমিক পর্যায় বর্ণনা করার পর এখন ঘটনা সংক্ষেপ করে এর শুধুমাত্র শেষ দৃশ্য দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে।

৪২. উল্লেখ্য, বনী ইসরাঈলের জনবসতি মিসরের কোন এক জায়গায় একসাথে ছিল না। বরং দেশের সমস্ত শহরে ও পল্লীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বিশেষ করে মামফিস (MAMPHIS) থেকে রাম্‌সিস পর্যন্ত এলাকায় তাদের বৃহত্তর অংশ বসবাস করতো। এ এলাকা জুশান নামে পরিচিত ছিল। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আ'রাফ, বনী ইসরাঈলের নির্গমন পথের নকশা) কাজেই হযরত মূসাকে যখন হুকুম দেয়া হয়েছিল যে,

فَأَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٧﴾ وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٥٨﴾ كَذٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾

এভাবে আমি তাদেরকে বের করে এনেছি তাদের বাগ–বাগীচা, নদী–নির্ঝরিনী, ধন–ভাণ্ডার ও সুরম্য আবাসগৃহসমূহ থেকে।৪৪ এসব ঘটেছে তাদের সাথে আর (অন্যদিকে) আমি বনী ইসরাঈলকে ঐ সব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি।৪৫

তোমাকে এবার বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে বের হয়ে যেতে হবে, তখন সম্ভবত তিনি দেশের সমস্ত বনী ইসরাঈলী বসতিতে সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে হিজরত করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য হয়তো একটি রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সে রাতে প্রত্যেক জনপদের মুহাজিরদের বের হয়ে পড়তে হবে। রাতের বেলা হিজরত করার জন্য বের হবার নির্দেশ কেন দেয়া হয়েছিল "তোমাদের পিছু নেয়া হবে" উক্তি থেকে তার ইংগিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ ফেরাউনের সেনাবাহিনী তোমাদের পিছনে ধাওয়া করার আগে রাতের মধ্যে তোমরা নিজেদের পথে অন্তত এত দূর অগ্রসর হয়ে যাওয়ার ফলে তারা অনেক পিছনে পড়ে যায়।

৪৩. একথাগুলো ফেরাউনের মনের গোপন ভীতি প্রকাশ করে। লোক দেখানো নির্ভীকতার মোড়কে সেই ভীতিকে সে ঢেকে রেখেছিল। একদিকে তাৎক্ষণিক সাহায্যের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে সে সৈন্য তলব করছিল। এ থেকে মনে হয় যে, সে বনী ইসরাঈলের দিক থেকে বিপদের আশংকা করছিল। অন্যদিকে আবার একথাটিও গোপন করতে চাচ্ছিল যে, একটি দীর্ঘকালের নিগৃহীত–নিষ্পেষিত এবং চরম লাঞ্ছনা ও দাসত্বের জীবন যাপনকারী জাতির দিক থেকে ফেরাউনের মতো মহাশক্তিধর শাসক কোন আশংকা অনুভব করছে, এমনকি ত্বরিত সাহায্যের জন্য সেনাবাহিনী তলব করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই নিজের বার্তা সে এমনভাবে পাঠাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে, বেচারা বনী ইসরাঈল তো সামান্য ব্যাপার মাত্র, মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক, তারা আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না কিন্তু তারা এমন সব কাজ করেছে যা আমাদের ক্রোধ উৎপাদন করেছে। তাই আমরা তাদেরকে শাস্তি দিতে চাই। কোন আশংকার কারণে আমরা সেনা সমাবেশ করছি না। বরং এটি নিছক একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ মাত্র। বিপদের কোন দূরতম সম্ভাবনা হলেও যথাসময়ে তার মূলোৎপাটনে প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

৪৪. অর্থাৎ ফেরাউনের মতে দূরতম এলাকা থেকে সেনাবাহিনী তলব করে বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করে সে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। কিন্তু আল্লাহ এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন যার ফলে তার নিজের কৌশলে সে নিজেই ফেঁসে গেলো। অর্থাৎ ফেরাউনী রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তারা নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে এমন এক জায়গায়

সমবেত হলো যেখানে তাদের সবাইকে এক সাথে সলিলসমাধি লাভ করতে হবে। যদি তারা বনী ইসরাঈলের পিছু না নিতো, তাহলে এর ফল কেবল এতটুকুই হতো যে, একটি জাতি দেশ ত্যাগ করে চলে যেতো। এর চেয়ে বেশী তাদের আর কোন ক্ষতি হতো না, ফলে তারা আগের মতোই বিলাস কুঞ্জে বসে আয়েশী জীবন যাপন করতো। কিন্তু তারা বুদ্ধিমত্তার পরম পরাকাষ্ঠা দেখনোর জন্য বনী ইসরাঈলকে নিরাপদে চলে না যেতে দেবার ফায়সালা করলো। শুধু তাই নয়, মুহাজির কাফেলাগুলোর ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে চিরকালের জন্য তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলো। এ উদ্দেশ্যে তাদের শাহজাদাবৃন্দ, বড় বড় সরদার ও রাজকর্মচারীরা তাদের শক্তিমদমত্ত বাদশাহকে সংগে নিয়ে নিজেদের প্রাসাদসমূহ থেকে বের হয় পড়লো। তাদের এহেন বুদ্ধিমত্তার এ দ্বিবিধ ফলও দেখা গেলো যে, বনী ইসরাঈল মিসর থেকে বের হয়েও গেলো আবার মিসরের জালেম ফেরাউনী সাম্রাজ্যের প্রধান জনশক্তি (cream) সাগরে বিসর্জিত হলো।

৪৫. কোন কোন তাফসীরকার এ আয়াতের অর্থ এভাবে গ্রহণ করেছেন ঃ যেসব উদ্যান, নদী, ধনভাণ্ডার ও উন্নত আবাসগৃহ ত্যাগ করে এ জালেমরা বের হয়েছিল মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে সেগুলোরই ওয়ারিশ বানিয়ে দেন। এ অর্থ যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, ফেরাউনের ডুবে মরার পর বনী ইসরাঈল আবার মিসরে পৌঁছে যাবে এবং ফেরাউনের বংশধরদের সমস্ত ধন-দৌলত এবং শক্তি, পরাক্রম ও গৌরবের অধিকারী হবে। কিন্তু এ জিনিসটি প্রথমত ইতিহাস থেকেও প্রমাণিত নয় এবং দ্বিতীয়ত কুরআনের অন্যান্য জায়গার বিস্তারিত বিববরণও আয়াতের এ অর্থ গ্রহণের অনুকূল নয়। সূরা বাকারাহ, মায়েদাহ, আ'রাফ ও তা-হা-তে যে ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, ফেরাউনের ডুবে মরার পর বনী ইসরাঈল মিসরে ফিরে আসার পরিবর্তে নিজেদের অভীষ্ট মনজিলের (ফিলিস্তীন) দিকেই এগিয়ে যেতে থাকে। তারপর থেকে হযরত দাউদের আমল (খৃঃ পূঃ ৯০৩-১০১৩) পর্যন্ত তাদের ইতিহাসের সব ঘটনাই আজকের পৃথিবীতে সিনাই উপদ্বীপ, উত্তর আরব, পূর্ব জর্দান (ট্রান্সজর্ডান) ও ফিলিস্তীন নামে পরিচিত এলাকায় ঘটেছে। তাই আমাদের মতে, যেসব উদ্যান, নদ-নদী, ধনভাণ্ডার ও সুরম্য অট্টালিকা থেকে ফেরাউনকে ও তার জাতির সরদারদেরকে বের করা হয়েছিল মহান আল্লাহ সেগুলোই বনী ইসরাঈলকে দান করেন, এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। বরং এর সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ একদিকে ফেরাউনের বংশধরদেরকে এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন এবং অন্যদিকে বনী ইসলাঈলকে এসব নিয়ামতই দান করেন। অর্থাৎ তারা ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে বাগ-বাগিচা, নদ-নদী, ধনভাণ্ডার ও উত্তম আবাসিক ভবন সমূহের অধিকারী হয়। সূরা আরাফের নিম্নোক্ত আয়াতে এ ব্যাখ্যার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ،

فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّاۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٦٢﴾ فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَۗ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿٦٣﴾ وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٦﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةًۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦٨﴾

সকাল হতেই তারা এদের পিছু নিয়ে বের হয়ে পড়লো। দু'দল যখন পরস্পরকে দেখতে পেলো তখন মূসার সাথিরা চিৎকার করে উঠলো, "আমরা তো পাকড়াও হয়ে গেলাম।" মূসা বললো, "কখখনো না, আমার সাথে আছেন আমার রব, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাবেন।"[৪৬] আমি মূসাকে অহীর মাধ্যমে হুকুম দিলাম, "মারো তোমার লাঠি সাগরের বুকে।" সহসাই সাগর দীর্ণ হয়ে গেলো এবং তার প্রত্যেকটি টুকরা হয়ে গেলো এক একটি বিশাল পাহাড়ের মতো।[৪৭] এ জায়গায়ই আমি দ্বিতীয় দলটিকেও নিকটে আনলাম।[৪৮] মূসা ও তার সমস্ত লোককে যারা তার সংগে ছিল আমি উদ্ধার করলাম এবং অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।

এ ঘটনার মধ্যে আছে একটি নিদর্শন।[৪৯] কিন্তু এদের অধিকাংশ মান্যকারী নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালীও আবার দয়াময়ও।

"তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছিল এবং তা থেকে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। আর তাদের পরিবর্তে আমি যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদেরকে এমন একটি দেশের পূর্ব ও পশ্চিমের ওয়ারিস বানিয়ে দিলাম যাকে আমি সমৃদ্ধিতে ভরে দিয়েছিলাম।" (১৩৬-১৩৭ আয়াত)

এ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ দেশের উপমা কুরআন মজীদে সাধারণত ফিলিস্তীনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যখন কোন এলাকার নাম না নিয়ে এ গুণটি বর্ণনা করা হয় তখন এ থেকে এ এলাকার কথা বলা হয়েছে বলে মনে করা হয়। যেমন সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে ঃ

اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ

এবং সূরা আম্বিয়ায়ে বলা হয়েছে ঃ

وَنَجَّيْنَٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَٰلَمِينَ

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا -

এভাবে সূরা সাবা—এ বলা হয়েছে ٱلْقُرَى ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا এ সবগুলো আয়াতে বরকত শব্দ ফিলিস্তীনের জনপদগুলোর সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়েছে।

৪৬. অর্থাৎ এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার পথ আমাকে জানাবেন।

৪৭. মূলে كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় বড় পাহাড়কে طود (তওদ) বলা হয়। লিসানুল আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে الطود - الجبل العظيم অর্থাৎ 'তওদ' মানে বিশাল পাহাড়। কাজেই এর পরে আবার عظيم গুণবাচক শব্দটি ব্যবহার করার অর্থ দাঁড়ায়—পানি উভয় দিকে খুব উঁচু উঁচু পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর আমরা এ বিষয়টিও চিন্তা করি যে, হযরত মূসার লাঠির আঘাতে সমুদ্রে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল। এ কাজটি একদিকে বনী ইসরাঈলের সমগ্র কাফেলাটির সাগর অতিক্রম করার জন্য করা হয়েছিল এবং অন্যদিকে এর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সমস্ত সৈন্য সামন্তকে ডুবিয়ে দেয়া। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, লাঠির আঘাতে পানি বিশাল উঁচু পাহাড়ের আকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং এতটা সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল, যতটা সময় লেগেছিল হাজার হাজার লাখো লাখো বনী ইসরাঈল তার মধ্য দিয়ে সাগর অতিক্রম করতে। তারপর ফেরাউনের সমগ্র সেনাবাহিনী তার মাঝখানে পৌঁছে গিয়েছিল। একথা সুস্পষ্ট, সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে যে ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হয় তা যতই তীব্র ও বেগবান হোক না কেন তার প্রভাবে কখনো সাগরের পানি এভাবে বিশাল পাহাড়ের মতো এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না। এরপর আরো সূরা তা-হা-এ বলা হয়েছে ঃ فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا "তাদের জন্য সমুদ্রের বুকে শুকনো পথ তৈরি করে দাও।"

এর অর্থ দাঁড়ায়, সাগরের ওপর লাঠির আঘাত করার কারণে কেবল সাগরের পানি ফাঁক হয়ে গিয়ে দু'দিকে পাহাড় সমান উঁচু হয়ে যায়নি বরং মাঝখানে যে পথ বের হয় তা শুকনো খটখটেও হয়ে যায় এবং কোথাও এমন কোন কাদা থাকেনি যার ওপর দিয়ে হেঁটে চলা সম্ভব নয়। এ সংগে সূরা দু'খানের ২৪ আয়াতের এ শব্দগুলোও প্রণিধানযোগ্য যেখানে আল্লাহ হযরত মূসাকে নির্দেশ দেন, সমুদ্র অতিক্রম করার পর "তাকে এ অবস্থার ওপরই ছেড়ে দাও, ফেরাউনের সেনাদল এখানে নিমজ্জিত হবে।" এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মূসা সমুদ্রের অপর পারে উঠে যদি সমুদ্রের ওপর লাঠির আঘাত করতেন, তাহলে উভয় দিকে খাড়া পানির দেয়াল ভেংগে পড়তো এবং সাগর সমান হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ তাঁকে এরূপ করতে নিষেধ করেন, যাতে ফেরাউনের সেনাদল এ পথে নেমে আসে এবং তারপর পানি দু'দিক থেকে এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়। এটি একটি সুস্পষ্ট ও

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ﴿٧١﴾

৫ রুকূ'

আর তাদেরকে ইবরাহীমের কাহিনী শুনিয়ে দাও,[৫০] যখন সে তার বাপ ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমরা কিসের পূজা করো?"[৫১] তারা বললো, "আমরা কতিপয় মূর্তির পূজা করি এবং তাদের সেবায় আমরা নিমগ্ন থাকি।"[৫২]

দ্ব্যর্থহীন মু'জিযার বর্ণনা। যারা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের আওতায় এ ঘটনাটির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তাদের চিন্তার গলদ এ থেকে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা তা-হা, ৫৩ টীকা)

৪৮. অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সেনাদলকে।

৪৯. অর্থাৎ কুরাইশদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে শিক্ষা। এ শিক্ষাটি হচ্ছে ঃ হঠকারী লোকেরা প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ দেখেও কিভাবে ঈমান আনতে অস্বীকার করে যেতে থাকে এবং তারপর এ হঠকারিতার ফল কেমন ভয়াবহ হয়। ফেরাউন ও তার জাতির সমস্ত সরদার ও হাজার হাজার সেনার চোখে এমন পট্টি বাঁধা ছিল যে, বছরের পর বছর ধরে যেসব নিদর্শন তাদেরকে দেখিয়ে আসা হয়েছে সেগুলো তারা উপেক্ষা করে এসেছে, সবশেষে পানিতে ডুবে যাবার সময়ও তারা একথা বুঝলো না যে, সমুদ্র ঐ কাফেলার জন্য ফাঁক হয়ে গেছে, পানি পাহাড়ের মতো দু'দিকে খাড়া হয়ে আছে এবং মাঝখানে শুকনা রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। এ সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও তাদের জ্ঞানোদয় হলো না যে, মূসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে এবং এহেন শক্তির সাথে তারা লড়াই করতে যাচ্ছে। তাদের চেতনা জাগ্রত হলো এমন এক সময় যখন পানি দু'দিক থেকে তাদেরকে চেপে ধরেছিল এবং তারা আল্লাহর গযবের মধ্যে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল। সে সময় ফেরাউন চিৎকার করে উঠলো ঃ

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"আমি ঈমান আনলাম এই এই মর্মে যে, বনী ইসরাঈল যে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তরভুক্ত।" (ইউনুস ৯০ আয়াত)

অন্যদিকে ঈমানদারদের জন্যও এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন। সেটি হচ্ছে, জুলুম ও তার শক্তিগুলো বাহ্যত যতই সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিক না কেন শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য-সহায়তায় সত্য এভাবেই বিজয়ী এবং মিথ্যার শির এভাবেই নত হয়ে যায়।

৫০. এখানে হযরত ইবরাহীমের পবিত্র জীবনের এমন এক যুগের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যখন নবুওয়াত লাভ করার পর শিরক ও তাওহীদের বিষয় নিয়ে তাঁর নিজের পরিবার ও নিজের সম্প্রদায়ের সাথে সংঘাত শুরু হয়েছিল। সে যুগের ইতিহাসের বিভিন্ন

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

সে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা যখন তাদেরকে ডাকো তখন কি তারা তোমাদের কথা শোনে? অথবা তোমাদের কি কিছু উপকার বা ক্ষতি করে?" তারা জবাব দিল, "না, বরং আমরা নিজেদের বাপ-দাদাকে এমনটিই করতে দেখেছি।[৫৩]

ঘটনা কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত সূরাগুলোতে বর্ণিত হয়েছে ঃ আল বাকারাহ ৩৫ রুকূ', আল আন'আম ৯ রুক', মারয়াম ৩ রুকূ', আল আম্বিয়া ৫ রুকূ', আস্ সাফ্‌ফাত ৩ রুকূ' এবং আল মুমতাহিনাহ ১ রুকূ'।

হযরত ইবরাহীমের জীবনের এ যুগের ইতিহাস কুরআন মজীদ বিশেষভাবে বারবার সামনে এনেছে। এর কারণ হচ্ছে, আরবের লোকেরা সাধারণভাবে এবং কুরাইশরা বিশেষভাবে নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসারী মনে করতো। তারা বলতো এবং দাবী করতো, ইবরাহীমের ধর্মই তাদের ধর্ম। আরবের মুশরিকরা ছাড়াও ইহুদি ও খৃষ্টানরাও হযরত ইবরাহীমকে তাদের ধর্মীয় নেতা বলে দাবী করতো। এ জন্য কুরআন মজীদ বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করেছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে দীন নিয়ে এসেছিলেন তা ছিল সেই একই নির্ভেজাল দীন ইসলাম যা আরবীয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এনেছেন এবং যার সাথে তোমরা আজ সংঘাতে লিপ্ত হয়েছো। তিনি মুশরিক ছিলেন না। বরং শিরকের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর সংগ্রাম এবং এ সংগ্রামের কারণে তাকে নিজের বাপ, পরিবার, জাতি ও দেশ সবকিছু ত্যাগ করে সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও হিজাযে প্রবাসীর জীবন যাপন করতে হয়েছিল। অনুরূপভাবে তিনি ইহুদী ও খৃষ্টানও ছিলেন না। বরং ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদ তো তাঁর বহু শতাব্দী পরে জন্ম নিয়েছিল। এ ঐতিহাসিক যুক্তির কোন জবাব মুশরিক, ইহুদী ও খৃষ্টান কারো কাছে ছিল না। কারণ মুশরিকরাও স্বীকার করতো, আরবে মূর্তি পূজার প্রচলন হয়েছিল হযরত ইবরাহীমের কয়েক শত বছর পরে। অন্যদিকে ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদের জন্মের বহু পূর্বে হযরত ইবরাহীমের যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, একথা ইহুদী ও খৃষ্টানরা অস্বীকার করতো না। এর স্বতস্ফূর্ত ফল স্বরূপ বলা যায়, যেসব বিশেষ আকীদা বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের ওপর তারা নিজেদের দীনের ভিত্তি স্থাপন করে তা প্রথম থেকে প্রচলিত প্রাচীন দীনের অংশ নয় এবং এসব মিশ্রণ মুক্ত নির্ভেজাল আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত দীনই সঠিক দীন। এরি ভিত্তিতে কুরআন বলছে ঃ

مَا كَانَ إِبْرٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ط

قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧٧﴾ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾

একথায় ইবরাহীম বললো, "কখনো কি তোমরা (চোখ মেলে) সেই জিনিসগুলো দেখেছো যাদের বন্দেগী তোমরা ও তোমাদের অতীত পূর্বপুরুষেরা করতে অভ্যস্ত?[৫৪] এরা তো সবাই আমার দুশমন[৫৫] একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া,[৫৬] যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন,[৫৭] তারপর তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন।

"ইবরাহীম ইহুদিও ছিল না এবং খৃষ্টানও ছিল না বরং সে তো একজন একনিষ্ঠ মুসলিম ছিল। আর সে মুশরিকও ছিল না। আসলে ইবরাহীমের সাথে সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে বেশী অধিকার তাদের, যারা তার পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং (এখন এ অধিকার) এ নবীর এবং এর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের।"

(আলে ইমরান ঃ ৬৭–৬৮)

৫১. তারা কিসের পূজা করছে তা জানা হযরত ইবরাহীমের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ সেখানে তারা যেসব মূর্তির পূজা করতো তা তিনি নিজে দেখতেন। কাজেই তাঁর প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তিনি তাদের দৃষ্টি ও চিন্তা এদিকে আকৃষ্ট করতে চাচ্ছিলেন যে, তোমরা যেসব উপাস্যের সামনে ষষ্ঠাংগে প্রণিপাত করছো তাদের স্বরূপ কি? সূরা আম্বিয়াতে এ প্রশ্নটিকে এভাবে করা হয়েছে ঃ

"এসব কেমন প্রতিমা যেগুলোর প্রতি ভক্তিতে তোমরা গদগদ হচ্ছো?"

৫২. আমরা কিছু মূর্তির পূজা করি, এ জবাবও নিছক একটা সংবাদ জানিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বলা হয়নি। কারণ প্রশ্নকর্তা ও জবাবদাতা উভয়ের সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল। নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি তাদের অবিচলতাই ছিল এ জবাবের আসল প্রাণসত্তা। অর্থাৎ তারা আসলে বলতে চাচ্ছিল, হাঁ, আমরাও জানি এগুলো কাঠ ও পাথরের তৈরি প্রতিমা। আমরা এগুলোর পূজা করি। কিন্তু আমরা এ গুলোরই পূজা ও সেবা করে যাবো, এটিই আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাস।

৫৩. অর্থাৎ এরা আমাদের প্রার্থনা, মুনাজাত ও ফরিয়াদ শোনে অথবা আমাদের উপকার বা ক্ষতি করে মনে করে আমরা এদের পূজা করতে শুরু করেছি তা নয়। আমাদের এ পূজা-অর্চনার কারণ এটা নয়। বরং আমাদের এ পূজা–অর্চনার আসল কারণ হচ্ছে, আমাদের বাপ–দাদার আমল থেকে তা এভাবেই চলে আসছে। এভাবে তারা নিজেরাই একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, তাদের ধর্মের পেছনে তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই। অন্য কথায় তারা যেন বলছিল, তুমি আমাদের কি এমন নতুন কথা বলবে? আমরা নিজেরা দেখছি না এগুলো কাঠ ও পাথরের মূর্তি? আমরা কি জানি না, কাঠ শোনে না এবং পাথর কারো ইচ্ছা পূর্ণ করতে বা ব্যর্থ করে দিতে পারে না? কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষরা শত শত বছর ধরে বংশ পরম্পরায় এদের পূজা

করে আসছে। তোমার মতে তারা সবাই কি বোকা ছিল? তারা এসব নিস্প্রাণ মূর্তিগুলোর পূজা করতো, নিশ্চয়ই এর কোন কারণ থাকবে। কাজেই আমরাও তাদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে এ কাজ করছি।

৫৪. অর্থাৎ ব্যস, স্রেফ বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসছে বলেই তাকে সত্য ধর্ম বলে মেনে নিতে হবে, একটি ধর্মের সত্যতার জন্য শুধুমাত্র এতটুকু যুক্তিই কি যথেষ্ট? চোখ বন্ধ করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাবে এবং কেউ একবার চোখ খুলে দেখবেও না যাদের বন্দেগী-পূজা-অর্চনা করা হচ্ছে তাদের মধ্যে সত্যিই আল্লাহর গুণাবলী পাওয়া যায় কি না এবং আমাদের ভাগ্যের ভাংগা-গড়ার ক্ষেত্রে তারা কোন ক্ষমতা রাখে কি না?

৫৫. অর্থাৎ চিন্তা করলে আমি দেখতে পাই, যদি আমি এদের পূজা করি তাহলে আমার দুনিয়া ও আখেরাত দু'টোই বরবাদ হয়ে যাবে। আমি এদের ইবাদাত করাকে শুধুমাত্র অলাভজনক ও অক্ষতিকরই মনে করি না বরং উল্টা ক্ষতিকর মনে করি। তাই আমার মতে তাদেরকে পূজা করা এবং শত্রুকে পূজা করা এক কথা। তাছাড়া হযরত ইবরাহীমের এ উক্তির মধ্যে সূরা মারয়ামে যে কথা বলা হয়েছে সেদিকেও ইংগিত করা হয়েছে। সূরা মারয়ামে বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ○ كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, যাতে তারা তাদের জন্য শক্তির মাধ্যম হয়। কখ্খনো না, শিগগির সে সময় আসবে যখন তারা তাদের পূজা-ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং উল্টা তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।" (৮১-৮২ আয়াত)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে এবং পরিষ্কার বলে দেবে, আমরা কখনো তাদেরকে আমাদের পূজা করতে বলিনি এবং তারা আমাদের পূজা করতো একথা আমরা জানিও না।

এখানে প্রচার কৌশলের একটি বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য। হযরত ইবরাহীম একথা বলেননি যে, এরা তোমাদের শত্রু বরং বলছেন এরা আমার শত্রু। যদি তিনি বলতেন এরা তোমাদের শত্রু, তাহলে প্রতিপক্ষের হঠকারী হয়ে ওঠার বেশী সুযোগ থাকতো। তারা তখন বিতর্ক শুরু করতো এরা কেমন করে আমাদের শত্রু হয় বলো। পক্ষান্তরে যখন তিনি বললেন তারা আমার শত্রু তখন প্রতিপক্ষের জন্যও চিন্তা করার সুযোগ হলো। তারাও ভাবতে পারলো, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেমন নিজের ভালো-মন্দের চিন্তা করছেন তেমনি আমাদেরও নিজেদের ভালো-মন্দের চিন্তা করা উচিত। এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ) যেন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাবজাত আবেগ-অনুভূতির কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যার ভিত্তিতে তারা নিজেরাই হয় নিজেদের শুভাকাংখী এবং জেনে শুনে কখনো নিজেদের মন্দ চায় না। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি তো এদের ইবাদাত করার মধ্যে আগাগোড়াই ক্ষতি দেখি এবং জেনে বুঝে আমি নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারতে

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾
وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي
يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।[৫৮] তিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং পুনর্বার আমাকে জীবন দান করবেন। তাঁর কাছে আমি আশা করি, প্রতিদান দিবসে তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।[৫৯]

পারি না। কাজেই দেখে নাও আমি নিজে তাদের ইবাদাত-পূজা-অর্চনা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকছি। এরপর প্রতিপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই একথা চিন্তা করতে বাধ্য ছিল যে, তাদের লাভ কিসে এবং জেনে বুঝে তারা নিজেদের অমংগল চাচ্ছে না তো।

৫৬. অর্থাৎ পৃথিবীতে যেসব উপাস্যের বন্দেগী ও পূজা করা হয় তাদের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনই আছেন যার বন্দেগীর মধ্যে আমি নিজের কল্যাণ দেখতে পাই এবং যাঁর ইবাদাত আমার কাছে শত্রুর নয় বরং একজন প্রকৃত পৃষ্ঠপোশকের ইবাদাত বলে বিবেচিত হয়। এরপর হযরত ইবরাহীম একমাত্র রব্বুল আলামীনই ইবাদাতের হকদার কেন, এর কারণগুলো কয়েকটি বাক্যে বর্ণনা করেছেন। এভাবে তিনি নিজের প্রতিপক্ষের মনে এ অনুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন যে, তোমাদের কাছে তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য উপাস্যদের পূজা করার স্বপক্ষে বাপ-দাদার অনুকরণ ছাড়া বর্ণনা করার মতো আর কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই কিন্তু আমার কাছে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণ আছে, যা তোমরাও অস্বীকার করতে পারো না।

৫৭. এটি প্রথম কারণ, যার ভিত্তিতে আল্লাহ এবং একমাত্র আল্লাহই ইবাদাতের হকদার। প্রতিপক্ষও এ সত্যটি জানতো এবং মেনেও নিয়েছিল যে, আল্লাহ তাদের সৃষ্টিকর্তা। তাদের সৃষ্টিতে অন্য কারো কোন অংশ নেই, একথাও তারা স্বীকার করতো। এমন কি তাদের উপাস্যরা নিজেরাও যে আল্লাহর সৃষ্টি এ ব্যাপারে হযরত ইবরাহীমের জাতিসহ সকল মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল। নাস্তিকরা ছাড়া বাকি দুনিয়ার আর কোঁথাও কেউ একথা অস্বীকার করেনি। আল্লাহ বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা তাই হযরত ইবরাহীমের প্রথম যুক্তি ছিল, আমি একমাত্র তাঁর ইবাদাতকে সঠিক ও যথার্থ মনে করি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অন্য কোন সত্তা কেমন করে আমার ইবাদাতের হকদার হতে পারে, যেহেতু আমাকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে তার কোন অংশ নেই। প্রত্যেক সৃষ্টি অবশ্যি তার নিজের স্রষ্টার বন্দেগী করবে। যে তার স্রষ্টা নয়, তার বন্দেগী করবে কেন?

৫৮. একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার স্বপক্ষে এটি হচ্ছে দ্বিতীয় যুক্তি। যদি তিনি মানুষকে কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দিতেন এবং সামনের দিকে তার দুনিয়ায় জীবন যাপনের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখতেন তাহলেও মানুষের তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো সহায়তা চাওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতো। কিন্তু তিনি তো সৃষ্টি করার সাথে সাথে পথনির্দেশনা, প্রতিপালন, দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। যে মুহূর্তে মানুষ দুনিয়ায় পদার্পণ করে তখনই তার মায়ের বুকে দুধের ধারা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে স্তন চোষার ও গলা দিয়ে দুধ নিচের দিকে নামিয়ে নেবার কায়দা শিখিয়ে দেয়। তারপর এ প্রতিপালন, প্রশিক্ষণ ও পথ প্রদর্শনের কাজ প্রথম দিন থেকে শুরু হয়ে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বরাবর চালু থাকে। জীবনের প্রতি পর্যায়ে মানুষের নিজের অস্তিত্ব, বিকাশ, উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বের জন্য যেসব ধরনের সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় তা সবই তার স্রষ্টা পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সর্বত্রই সঠিকভাবে যোগান দিয়ে রেখেছেন। এ সাজ-সরঞ্জাম থেকে লাভবান হবার এবং একে কাজে লাগাবার জন্য তার যে ধরনের শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োজন তা সবও তার আপন সত্তায় সমাহিত রাখা হয়েছে। জীবনের প্রতিটি বিভাগে তার যে ধরনের পথনির্দেশনার প্রয়োজন হয় তা দেবার পূর্ণ ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন। এ সংগে তিনি মানবিক অস্তিত্বের সংরক্ষণের এবং তাকে বিপদ-আপদ, রোগ-শোক, ধ্বংসকর জীবাণু ও বিষাক্ত প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য তার নিজের শরীরের মধ্যে এমন শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন মানুষের জ্ঞান এখনো যার পুরোপুরি সন্ধান লাভ করতে পারেনি। আল্লাহর এ শক্তিশালী প্রাকৃতিক ব্যবস্থা যদি না থাকতো, তাহলে সামান্য একটি কাঁটা শরীরের কোন অংশে ফুটে যাওয়াও মানুষের জন্য ধ্বংসকর প্রমাণিত হতো এবং নিজের চিকিৎসার জন্য মানুষের কোন প্রচেষ্টাই সফল হতো না। স্রষ্টার এ সর্বব্যাপী অনুগ্রহ ও প্রতিপালন কর্মকাণ্ড যখন প্রতি মুহূর্তে সকল দিক থেকে মানুষকে সাহায্য করছে তখন মানুষ তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন সত্তার সামনে মাথা নত করবে এবং প্রয়োজন পূরণ ও সংকট উত্তরণের জন্য অন্য কারো আশ্রয় গ্রহণ করবে, এর চেয়ে বড় মূর্খতা ও বোকামী এবং এর চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা আর কী হতে পারে?

৫৯. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত যে ঠিক নয় এ হচ্ছে তার তৃতীয় কারণ। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক কেবলমাত্র এ দুনিয়া এবং এখানে সে যে জীবন যাপন করে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অস্তিত্বের সীমানায় পা রাখার পর থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথেই তা খতম হয়ে যায় না। বরং এরপর তার পরিণামও পুরোপুরি আল্লাহরই হাতে আছে। আল্লাহই তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। সবশেষে তিনি তাকে দুনিয়া থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যা মানুষের এ ফিরে যাওয়ার পথ রোধ করতে পারে। যে হাতটি মানুষকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যায় আজ পর্যন্ত কোন ঔষধ, চিকিৎসক দেব-দেবীর হস্তক্ষেপ তাকে পাকড়াও করতে পারেনি। এমন কি মানুষেরা যে একদল মানুষকে উপাস্য বানিয়ে পূজা-আরাধনা করেছে তারা নিজেরাও নিজেদের মৃত্যুকে এড়াতে পারেনি। একমাত্র আল্লাহই ফায়সালা করেন, কোন্ ব্যক্তিকে কখন এ দুনিয়া থেকে ফিরিয়ে নেবেন এবং যখন যার তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার সমন এসে যায় তখন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাকে চলে যেতেই হয়। তারপর আল্লাহ একাই ফায়সালা করেন, দুনিয়ায় যেসব মানুষ জন্ম নিয়েছিল তাদের সবাইকে

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

(এরপর ইবরাহীম দোয়া করলো ঃ) "হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করো [৬০] এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করো।[৬১] আর পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আমার সত্যিকার খ্যাতি ছড়িয়ে দিও[৬২] এবং আমাকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতের অধিকারীদের অন্তরভুক্ত করো। আর আমার বাপকে মাফ করে দাও, নিসন্দেহে তিনি পথভ্রষ্টদের দলভুক্ত[৬৩] ছিলেন এবং সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না যেদিন সবাইকে জীবিত করে উঠানো হবে,[৬৪] যেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে লাগবে না, তবে যে বিশুদ্ধ অন্তকরণ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে।"[৬৫]

কখন পুনর্বার জীবন দান করবেন এবং তাদের পৃথিবীর জীবনের কাজ-কারবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তখনো মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন থেকে কাউকে রেহাই দেয়া বা নিজে রেহাই পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। প্রত্যেককে তাঁর হুকুমে উঠতেই হবে এবং তাঁর আদালতে হাজির হতেই হবে। তারপর সেই আল্লাহ একাই সেই আদালতের বিচারপতি হবেন। তাঁর ক্ষমতায় কেউ সামান্যতমও শরীক হবে না। শাস্তি দেয়া বা মাফ করা উভয়টিই হবে সম্পূর্ণ তাঁর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি যাকে শাস্তি দিতে চান কেউ তাকে ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখে না। অথবা তিনি কাউকে ক্ষমা করতে চাইলে কেউ তাকে শাস্তি দিতে পারবে না। দুনিয়ায় যাদেরকে ক্ষমা করিয়ে নেবার ইখতিয়ার আছে বলে মনে করা হয় তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষমার জন্য তাঁরই অনুগ্রহ ও দয়ার দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকবে। এসব জাজ্বল্যমান সত্যের উপস্থিতিতে যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী করে সে নিজেই নিজের অশুভ পরিণামের ব্যবস্থা করে। দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের ভাগ্য পুরোপুরি ন্যস্ত থাকে আল্লাহর হাতে। আর সেই ভাগ্য গড়ার জন্য মানুষ এমন সব সত্তার আশ্রয় নেবে যাদের হাতে কিছুই নেই, এরচেয়ে বড় ভাগ্য বিপর্যয় আর কী হতে পারে?

৬০. "হুকুম" অর্থ এখানে নবুওয়াত গ্রহণ করা সঠিক হবে না। কারণ এটা যে সময়ের দোয়া সে সময় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত দান করা হয়ে গিয়েছিল। আর ধরে নেয়া যাক যদি এ দোয়া তার আগেরও হয়ে থাকে, তাহলে নবুওয়াত কেউ চাইলে তাকে দান করা হয় না বরং এটি এমন একটি দান যা আল্লাহ নিজেই যাকে চান

তাকে দান করেন। তাই এখানে 'হুক্‌ম' অর্থ জ্ঞান, হিকমত, প্রজ্ঞা, সঠিক বুঝ-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত করার শক্তি গ্রহণ করাই সঠিক হবে। হযরত ইবরাহীমের (আ) এ দোয়াটি প্রায় সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে অর্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ দোয়া উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন أَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ অর্থাৎ আমাদের এমন যোগ্যতা দাও যাতে আমরা প্রত্যেকটি জিনিসকে তার যথার্থ স্বরূপে দেখতে পারি এবং প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যা তার প্রকৃত স্বরূপের প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা উচিত।

৬১. অর্থাৎ দুনিয়ায় আমাকে সৎ সমাজ-সংসর্গ দান করো এবং আখেরাতের ময়দানে সৎলোকদের সাথে আমাকে সমবেত করো। আখেরাত সম্পর্কে বলা যায়, আখেরাতের ময়দানে সৎলোকদের সাথে কারো সমবেত হওয়া তার মুক্তি লাভ করার সমার্থক হয়ে থাকে। তাই মৃত্যু পরের জীবন ও কিয়ামতের ময়দানে কর্মের প্রতিফল দানের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এ দোয়া করা উচিত। কিন্তু দুনিয়াতেও পবিত্র জীবনের অধিকারী সৎকর্মশীল ব্যক্তির অন্তরের আকাংখাই এই হয়ে থাকে যে, আল্লাহ যেন তাকে একটি ফাসেক, নোংরা ও অসুস্থ সমাজে জীবন যাপন করার বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দেন এবং সৎলোকদের সাথে ওঠা-বসা ও চলা-ফেরা করার সুযোগ দান করেন। সামাজিক বিকৃতি ও অসুস্থতা যেখানে চারদিকে বিস্তার লাভ করে সেখানে কেবলমাত্র এটাই সর্বক্ষণ একজন লোককে মানসিক পীড়া দেয় না যে, তার চারদিকে সে কেবল নোংরামীই নোংরামী দেখছে বরং তার নিজের পবিত্র জীবন যাপন করা এবং দূষিত আবর্জনার ছিটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাও তার পক্ষে কঠিন হয়ে থাকে। তাই একজন সৎলোক ততক্ষণ পর্যন্ত অস্থির থাকে যতক্ষণ না তার নিজের সমাজ পবিত্র ও সুস্থ হয়ে যায় অথবা সে এ সমাজ থেকে বের হয়ে সত্য ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত অন্য একটি সমাজের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়।

৬২. অর্থাৎ ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন মর্যাদা ও শুভেচ্ছা সহকারে আমার নাম স্মরণ করে। দুনিয়ায় যেন আমি এমন কাজ না করে যাই যার ফলে ভবিষ্যত বংশধররা আমার পরে আমাকে এমন সব জালেমদের দলভুক্ত করে যারা নিজেরাও ছিল অসৎ ও বিকৃত চরিত্রের অধিকারী এবং দুনিয়াকেও অসৎ ও বিকৃতির পথে চালিয়ে গেছে। বরং আমি যেন এমন সব কাজ করে যাই যার ফলে কিয়ামত পর্যন্ত আমার জীবন মানুষের জন্য আলোক বর্তিকার কাজ করে এবং আমাকে মানব হিতৈষী ও মানব জাতির সেবক গণ্য করা হয়। এটি নিছক লোক দেখানো খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের দোয়া নয় বরং প্রকৃত সুখ্যাতি ও যথার্থ সুনাম অর্জনের দোয়া। নিশ্চিত খাঁটি জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম ও সেবাকর্মের ফলে এ সুখ্যাতি অর্জিত হয়। কোন ব্যক্তির এ জিনিস অর্জিত হলে দু'টো লাভ ও উপকার হয়। দুনিয়ায় এর ফলে মানব জাতির ভবিষ্যত বংশধররা খারাপ আদর্শের পরিবর্তে একটি ভালো আদর্শ পেয়ে যায়। এ থেকে তারা ভালো দৃষ্টান্ত লাভ করে এবং ভালো দৃষ্টান্ত থেকে পায় ভালো হবার শিক্ষা। প্রত্যেক সৎব্যক্তি এর মাধ্যমে সত্য-সঠিক পথে চলার প্রেরণা লাভ করে। আর আখেরাতে এর ফলে এক ব্যক্তির ভালো কর্মকাণ্ড অনুসরণ করে যত জন লোকই সৎপথের সন্ধান লাভ করে তাদের সওয়াব সে ও লাভ করবে এবং কিয়ামতের দিন তার নিজের কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে কোটি কোটি মানুষের সাক্ষ্যও তার

সপক্ষে উপস্থিত থাকবে যাতে বলা হবে, সে দুনিয়ায় কল্যাণ ও সৎকর্মের এমন স্রোত ধারা প্রবাহিত করে এসেছিল যে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম যুগ যুগ ধরে সে ধারায় অবগাহন করেছে।

৬৩. কোন কোন মুফাস্সির হযরত ইবরাহীমের মাগফেরাতের দোয়ার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, তাঁর এ মাগফেরাত কামনা ছিল ইসলামের শর্তসাপেক্ষে। কাজেই তাঁর নিজের পিতার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করাটা ছিল যেন আল্লাহ তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দান করেন, এ ধরনের একটি দোয়া। কিন্তু কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা সংশ্লিষ্ট মুফাস্সিরগণের এ ব্যাখ্যার সাথে মেলে না। কুরআন বলছে, হযরত ইবরাহীম নিজের পিতার জুলুম সইতে না পেরে যখন ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন তখন বলেন ঃ

سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ○

"আপনাকে সালাম, আমি আপনাকে ক্ষমা করার জন্য নিজের রবের কাছে দোয়া করবো। তিনি আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান।" (মার্‌য়াম, ৪৭ আয়াত)

এ প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তিনি এ মাগফেরাতের দোয়া করেন কেবলমাত্র নিজের পিতার জন্য নয় বরং অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে মাতা ও পিতা উভয়ের জন্য করেন ঃ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ "হে আমাদের রব! আমার গোনাহ মাফ করো এবং আমার মাতা-পিতারও।" (ইবরাহীম, ৪১ আয়াত) কিন্তু পরে তিনি নিজেই অনুভব করেন, একজন সত্যের দুশমন একজন মু'মিনের পিতা হলেও মাগফেরাতের দোয়ার হকদার হয় না।

مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ۭ

"ইবরাহীমের নিজের পিতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা নিছক তার প্রতিশ্রুতির কারণে ছিল, যা সে করেছিল। কিন্তু সে যে আল্লাহর দুশমন, একথা যখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল তখন সে তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করলো।"

(আত্ তাওবা, ১১৪ আয়াত)

৬৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমাকে এমন অপমানকর অবস্থার সম্মুখীন করো না যেখানে হাশরের ময়দানে পূর্বের ও পরের সমগ্র জনগোষ্ঠী একত্র হবে সেখানে তাদের সবার সামনে ইবরাহীমের পিতা শাস্তি পেতে থাকবে এবং ইবরাহীম তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে।

৬৫. এ বাক্যাংশ দু'টি কি হযরত ইবরাহীমের (আ) দোয়ার অংশ অথবা আল্লাহ তাঁর বক্তব্যের সাথে নিজে এটুকু বাড়িয়ে যোগ করে দিয়েছেন, একথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। যদি প্রথম কথাটি মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, হযরত ইবরাহীম (আ) নিজের পিতার জন্য এ দোয়া করার সময় নিজেই এ সত্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝٩٠ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۝٩١ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۝٩٢ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ۝٩٣ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ۝٩٤ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۝٩٥ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۝٩٦ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝٩٧ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٩٨ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۝٩٩

—(সেদিন[৬৬]) জান্নাত মুত্তাকীদের কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে এবং জাহান্নাম পথভ্রষ্টদের সামনে খুলে দেয়া হবে।[৬৭] আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদাত করতে তারা এখন কোথায়? তারা কি এখন তোমাদের কিছু সাহায্য করছে অথবা আত্মরক্ষা করতে পারে?" তারপর সেই উপাস্যদেরকে এবং এই পথভ্রষ্টদেরকে আর ইবলীসের বাহিনীর সবাইকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।[৬৮] সেখানে এরা সবাই পরস্পর ঝগড়া করবে এবং পথভ্রষ্টরা (নিজেদের উপাস্যদেরকে) বলবে, "আল্লাহর কসম আমরা তো স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলাম, যখন তোমাদের দিচ্ছিলাম রব্বুল আলামীনের সমকক্ষের মর্যাদা। আর এ অপরাধীরাই আমাদের ভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে।[৬৯]

আর দ্বিতীয় কথাটি মেনে নেয়া হলে এর অর্থ হবে, তাঁর দোয়ার ওপর মন্তব্য প্রসংগে আল্লাহ একথা বলছেন যে, কিয়ামতের দিন যদি কোন জিনিস মানুষের কাজে লাগতে পারে, তাহলে তা তার ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি নয় বরং একমাত্র প্রশান্ত চিত্ত এমন একটি অন্তর যা কুফরী, শিরক, নাফরমানী, ফাসেকী ও অশ্লীল কার্যকলাপ মুক্ত। ধনসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও প্রশান্ত ও নির্মল অন্তরের সাথেই উপকারী হতে পারে। প্রশান্ত অন্তরকে বাদ দিয়ে এদের কোন উপকারিতা নেই। ধন সেখানে কেবলমাত্র এমন অবস্থায় উপকারী হবে যখন মানুষ দুনিয়ায় ঈমান ও অন্তরিকতা সহকারে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। নয়তো কোটিপতি ও বিলিয়ন বিলিয়ন সম্পদের মালিকরাও সেখানে পথের ভিখারীই হবে। সন্তানদেরও দুনিয়ায় মানুষ নিজের সামর্থ অনুযায়ী ঈমান ও সৎ-কর্মের শিক্ষা দিলে তবেই তারা সেখানে কাজে লাগতে পারে। অন্যথায় পুত্র যদি নবীও হয়ে থাকেন, তাহলে যে পিতা কুফরী ও গোনাহের মধ্যে নিজের জীবনকাল শেষ করেছে এবং সন্তানের সৎকাজে যার কোন অংশ নেই তার শাস্তি পাওয়া থেকে কোন নিষ্কৃতি নেই।

৬৬. এখান থেকে শেষ প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত সমস্ত বাক্য হযরত ইবরাহীমের (আ) উক্তির অংশ মনে হয় না বরং এর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার মনে হয় যে, এগুলো আল্লাহর উক্তি।

৬৭. অর্থাৎ একদিকে মুত্তাকিরা জান্নাতে প্রবেশ করার আগেই দেখতে থাকবে, আল্লাহর মেহেরবানীতে কেমন নিয়ামতে পরিপূর্ণ জায়গায় তারা যাবে। অন্যদিকে পথভ্রষ্টরা তখনো হাশরের ময়দানেই অবস্থান করবে। যে জাহান্নামে তাদের গিয়ে থাকতে হবে তার ভয়াবহ দৃশ্য তাদের সামনে উপস্থাপিত করা হবে।

৬৮. মূলে كُبْكِبُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি অর্থ নিহিত। এক, একজনের ওপর অন্য একজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে। দুই, তারা জাহান্নামের গর্তের তলদেশ পর্যন্ত গড়িয়ে যেতে থাকবে।

৬৯. ভক্ত-অনুরক্তদের পক্ষ থেকে এভাবে তাদের খাতির তোয়াজ করা হবে। অথচ এ ভক্ত-অনুরক্তরাই দুনিয়ায় এদেরকে বুজর্গ, গুরু ও নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। এদের হাতে-পায়ে চুমো দেয়া হতো। এদের কথা ও কাজকে প্রামাণ্য ও আদর্শ বলে স্বীকার করা হতো। এদের সমীপে নজরানা ও মানত পেশ করা হতো। পরকালে গিয়ে যখন সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং অনুসারীবৃন্দ জানতে পারবে অগ্রবর্তীরা কোথায় চলে এসেছে এবং তাদেরকে কোথায় নিয়ে এসেছে তখন এ ভক্ত-অনুরক্তের দল তাদেরকে অপরাধী গণ্য করবে এবং অভিশাপ দেবে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে পরকালীন জগতের এ শিক্ষনীয় চিত্র অংকন করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ায় অন্ধ অনুসারীদের চোখ খুলে যায় এবং কারো পেছনে চলার আগে তারা দেখে নিতে পারে অগ্রবর্তীরা সঠিক পথে যাচ্ছে কিনা। সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ط حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا لا قَالَتْ اُخْرٰهُمْ لِاُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ط قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ○

"প্রত্যেকটি দল যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তার নিজের সাথী দলের ওপর অভিশাপ দিতে দিতে যাবে। এমন কি যখন সবাই সেখানে একত্র হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের রব! এরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, এখন এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দাও। রব বলবেন, সবার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি কিন্তু তোমরা জানো না।" (৩৮ আয়াত)

সূরা হা-মীম আস্ সাজদায় বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ○

"আর কাফেররা সে সময় বলবে, হে আমাদের রব! জিন ও মানুষদের মধ্য থেকে তাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, যাতে আমরা তাদেরকে পায়ের তলায় পিষে ফেলতে পারি এবং তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।" (২৯ আয়াত)

فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

এখন আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই[৭০] এবং কোন অন্তরংগ বন্ধুও নেই।[৭১] হায় যদি আমাদের আবার একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ মিলতো, তাহলে আমরা মু'মিন হয়ে যেতাম।"[৭২]

নিসন্দেহে এর মধ্যে একটি বড় নিদর্শন রয়েছে,[৭৩] কিন্তু এদের অধিকাংশ মু'মিন নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালীও এবং করুণাময়ও।

এ বিষয়বস্তুটিই সূরা আহযাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ○ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ○

"আর তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছি এবং তারা আমাদের সোজা পথ থেকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর লানত বর্ষণ করো।" (৬৭–৬৮ আয়াত)

৭০. অর্থাৎ যাদেরকে আমরা দুনিয়ায় সুপারিশকারী মনে করতাম এবং যাদের সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, তাদের পক্ষপুটে যে আশ্রয় নিয়েছে, সে বেঁচে গেছে। তাদের কেউ সুপারিশ করার জন্য মুখ খুলবে না।

৭১. অর্থাৎ এমন কেউ নেই, যে আমাদের দুঃখে দুঃখ অনুভব করে এবং আমাদের ব্যথায় সমব্যথী হয়। অন্তত আমাদের ছাড়িয়ে নিতে না পারলেও আমাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করবে এমনও কেউ নেই। কুরআন মজীদ বলছে, আখেরাতে একমাত্র মুমিনদের মধ্যে বন্ধুত্ব অব্যাহত থাকবে। অন্যদিকে পথভ্রষ্টরা দুনিয়ায় যতই গভীর ও আন্তরিক বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ থেকে থাক না কেন সেখানে পৌঁছে তারা পরস্পরের প্রাণের শত্রুতে পরিণত হবে। তারা পরস্পরকে অপরাধী গণ্য করবে এবং পরস্পরকে পরস্পরের ধ্বংস ও সর্বনাশের জন্য দায়ী করে একে অন্যকে বেশী শাস্তি দান করাবার চেষ্টা করবে।

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ –

"বন্ধুরা সেদিন হবে একে অন্যের শত্রু কিন্তু মুত্তাকীদের বন্ধুত্ব অপরিবর্তিত থাকবে।" (আয্ যুখ্রুফঃ ৬৭ আয়াত)

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾

৬ রুকূ'

নূহের[৭৪] সম্প্রদায় রসূলদেরকে মিথ্যুক বললো।[৭৫] স্মরণ করো যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা কি ভয় করো না?[৭৬]

৭২. এ আকাংখার জবাবও কুরআনে দেয়া হয়েছে ঃ

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ

"যদি তাদেরকে পূর্ববর্তী জীবনে ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা তাই করতে থাকবে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।" (আন'আম ঃ ২৮ আয়াত)

যেসব কারণে তাদেরকে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হবে না তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তাফহীমুল কুরআন সূরা মু'মিনূনের ৯০ থেকে ৯২ টীকায়।

৭৩. হযরত ইবরাহীমের এ কাহিনীতে নিদর্শনের তথা শিক্ষার দু'টি দিক রয়েছে। একটি দিক হচ্ছে, আরবের মুশরিকরা একদিকে হযরত ইবরাহীমের (আ) অনুসারী হবার দাবী করতো এবং তাঁর সাথে নিজেদের সম্পর্ক দেখিয়ে গর্ব করতো। কিন্তু অন্যদিকে তারা সেই একই শির্‌কে লিপ্ত রয়েছে যার বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন এবং তিনি যে দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন আজ যে নবী তা পেশ করছেন তার বিরুদ্ধে তারা ঠিক তাই করছে যা হযরত ইবরাহীমের জাতি তাঁর সাথে করেছিল। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, হযরত ইবরাহীম তো ছিলেন শির্‌কের শত্রু ও তাওহীদের দাওয়াতের পতাকাবাহী। তোমরা নিজেরাও জানো, হযরত ইবরাহীম মুশরিক ছিলেন না। কিন্তু এরপরও তোমরা নিজেদের জিদ বজায় রেখে চলছো। এ কাহিনীতে নিদর্শনের দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, ইবরাহীমের জাতি দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, কোথাও তাদের নাম নিশানাও নেই। তাদের মধ্য থেকে যদি কারো বেঁচে থাকার সৌভাগ্য হয়ে থাকে তাহলে তারা হচ্ছেন কেবলমাত্র হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর দুই ছেলের (ইসমাঈল ও ইসহাক) বংশধরগণ। হযরত ইবরাহীম তাঁর জাতির মধ্য থেকে বের হয়ে যাবার পর তাদের ওপর যে আযাব আসে কুরআন মজীদে যদিও তার উল্লেখ নেই কিন্তু আযাব প্রাপ্ত জাতিদের মধ্যে তাদেরকে গণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيْمَ وَأَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ - (التوبة : ٧٠)

৭৪. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন আল আরাফ ৫৯–৬৪, ইউনুস ৭১–৭৩, হূদ ২৫–৪৮, বনী ইসরাঈল ৩, আল আম্বিয়া ৭৬–৭৭, আল মু'মিনূন ২৩–৩০, আল ফুরকান ৩৭ আয়াত এবং এছাড়া নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল।[৭৭] কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।[৭৮] একাজে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমাকে প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের।[৭৯]

নিম্নোক্ত স্থানগুলোও সামনে রাখুনঃ আল আনকাবূত ১৪-১৫, আস্ সাফ্ফাত ৭৫-৮২, আল কামার ৯-১৫ আয়াত এবং সূরা নূহ সম্পূর্ণ।

৭৫. যদিও তারা একজন মাত্র রসূলকে অস্বীকার করেছিল কিন্তু যেহেতু রসূলকে অস্বীকার করা আসলে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে পয়গাম নিয়ে এসেছেন তাকে অস্বীকার করা হয়, তাই যে ব্যক্তি বা দল কোন একজন রসূলকেও অস্বীকার করে সে আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল রসূলকে অস্বীকারকারীতে পরিণত হয়। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সত্য। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি তাদেরকেও কাফের গণ্য করা হয়েছে যারা কেবলমাত্র একজন নবীকে অস্বীকার করতো এবং অন্যান্য সকল নবীকে মানতো। এর কারণ হচ্ছে, যে ব্যক্তি রিসালাতের মূল পয়গাম মেনে নেয় সে অনিবার্যভাবে প্রত্যেক রসূলকে মেনে নেবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন একজন রসূলকে অস্বীকার করে সে যদি অন্য সকল রসূলকে মানেও তাহলে কোন গোত্র, দল বা সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতি অথবা পূর্ব পুরুষদের অনুসৃতির কারণেই মানে, রিসালাতের মূল পয়গামকে মানে না। অন্যথায় একই সত্য একজন পেশ করলে মেনে নেবে এবং অন্যজন পেশ করলে অস্বীকার করবে, এটা কখনো সম্ভব ছিল না।

৭৬. অন্যান্য স্থানে হযরত নূহ তাঁর নিজের জাতিকে যে প্রাথমিক সম্বোধন করেছিলেন তার শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ

أُعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○

"আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই, তাহলে তোমরা কি ভয় করো না?" (আল মু'মিনূন ২৩ আয়াত)

أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ○

"আল্লাহর বন্দেগী করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।"
(নূহ ৩ আয়াত)

তাই এখানে হযরত নূহের এ উক্তির অর্থ নিছক ভীতি নয় বরং আল্লাহ ভীতি। অর্থাৎ তোমাদের কি আল্লাহর ভয় নেই? তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের বন্দেগী করার সময় তোমরা একটুও ভেবে দেখো না, এ বিদ্রোহাত্মক নীতির পরিণাম কি হবে?

দাওয়াতের সূচনায় ভয় দেখাবার কারণ হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি বা দলকে তার ভুল নীতির অশুভ পরিণামের ভীতি অনুভব করানো যায় ততক্ষণ সে সঠিক কথা ও তার যুক্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতে উদ্যোগী হয় না, মানুষের মনে সঠিক পথের অনুসন্ধিৎসা তখনই জন্ম নেয় যখন তার মনে এ চিন্তা জাগে যে, সে কোন বাঁকা পথে যাচ্ছে না তো, যেখানে ধ্বংসের কোন আশংকা আছে।

৭৭. এর দু'টি অর্থ হয়। এক, আমি নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বানিয়ে বা কমবেশী করে বলি না বরং যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ওপর নাযিল হয় তাই হুবহু বর্ণনা করি। দুই, আমি এমন একজন রসূল যাকে তোমরা আগে থেকেই একজন সত্যবাদী ও আমানতদার হিসেবে জানো। মানুষের ব্যাপারে যখন আমি আমানতের খেয়ানত করি না তখন আল্লাহর ব্যাপারে কেমন করে আমানতের খেয়ানত করতে পারি। কাজেই তোমাদের জানা উচিত, আমি যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করছি সে ব্যাপারে আমি ঠিক তেমনিই আমানতদার যেমন দুনিয়ার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত তোমরা আমাকে পেয়েছো।

৭৮. অর্থাৎ আমার আমানতদার রসূল হবার অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, তোমরা অন্য সবার আনুগত্য পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার আনুগত্য করবে এবং আমি তোমাদের যে বিধান দেবো তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবে। কারণ আমি বিশ্ব–জাহানের প্রভুর ইচ্ছার প্রতিনিধি। আমার আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের সমান। আর আমার নাফরমানী করা নিছক আমার সত্তার নাফরমানী করা নয় বরং সরাসরি আল্লাহর নাফরমানীর নামান্তর। অন্য কথায় এর অর্থ দাঁড়ায়, রসূলের অধিকার শুধুমাত্র এতটুকুন নয় যে, যাদের কাছে তাঁকে রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে তারা তাঁর সত্যবাদিতা মেনে নেবে এবং তাঁকে সত্য রসূল হবার স্বীকৃতি দেবে। বরং তাঁকে আল্লাহর সত্য রসূল বলে মেনে নেবার সাথে সাথেই তাঁর আনুগত্য করা এবং অন্য সমস্ত আইন পরিহার করে একমাত্র তিনি যে আইন এনেছেন তার আনুগত্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। রসূলকে রসূল বলে স্বীকার না করা অথবা রসূল বলে স্বীকার করার পর তাঁর আনুগত্য না করা উভয় অবস্থাই আসলে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর এবং উভয়েরই ফল হয় আল্লাহর গযবের আওতায় চলে আসা। তাই ঈমান ও আনুগত্যের দাবীর আগে "আল্লাহকে ভয় করো" এর সতর্কতামূলক বাক্য উচ্চারণ করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি ভালোভাবে কান খুলে রসূলের রিসালাত স্বীকার না করা অথবা তাঁর আনুগত্য গ্রহণ না করার ফল কি হবে তা শুনে নিতে পারে।

৭৯. এটি হচ্ছে হযরত নূহের সত্যতার সপক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি। প্রথম যুক্তি ছিল, নবুওয়াত দাবীর পূর্বে আমার সমগ্র জীবন তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত তোমরা আমাকে একজন আমানতদার হিসেবেই জানো। আর দ্বিতীয় যুক্তিটি হচ্ছে, আমি একজন নিস্বার্থপর ব্যক্তি। একাজের মাধ্যমে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার হচ্ছে অথবা নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ করার জন্য আমি প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, এমন কোন ব্যক্তিগত লাভ বা স্বার্থ তোমরা চিহ্নিত করতে পারবে না। এহেন নিস্বার্থভাবে কোন ব্যক্তিগত লাভ ছাড়াই যখন আমি এ সত্যের দাওয়াতের কাজে দিনরাত প্রাণপাত করে যাচ্ছি, নিজের

সময় ও শ্রম নিয়োগ করছি এবং সকল প্রকার কষ্ট বরদাশ্‌ত করছি তখন তোমাদের জানা উচিত, আমি আন্তরিকতা সহকারে একাজ করে যাচ্ছি। ঈমানদারীর সাথে যে জিনিসকে সত্য মনে করি এবং যার আনুগত্যের মধ্যে আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ ও সাফল্য দেখি তাই পেশ করছি। আমার একাজের পেছনে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্যোগ নেই। এ স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য মিথ্যা বলে লোকদের ধোকা দেবার কোন প্রয়োজন আমার নেই।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ কুরআন মজীদ বারবার এ যুক্তি দু'টি পেশ করেছে এবং এ দু'টিকে নবুওয়াত যাচাই করার মানদণ্ড গণ্য করেছে। নবুওয়াত লাভ করার আগে যে ব্যক্তি একটি সমাজে বছরের পর বছর জীবনযাপন করেছেন এবং লোকেরা সবসময় সব ব্যাপারে তাঁকে সত্যবাদী, নিখাদ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছে তার সম্পর্কে কোন নিরপেক্ষ মানুষ এরূপ সন্দেহ করতে পারে না যে, তাঁকে নবী না করা সত্ত্বেও তিনি বলবেন, আল্লাহ আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন। সারা জীবনে একটিবারও যে ব্যক্তি মিথ্যা বলেনি। সে হঠাৎ আল্লাহর নামে এত বড় একটি মিথ্যা বলতে উদ্যত হবে, তা কোন নিরাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে ধারণা করা বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তারপর দ্বিতীয় কথাটা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ সে কথাটি হচ্ছে, কোন ব্যক্তি সদুদ্দেশ্যে এতবড় ডাহা মিথ্যা তৈরি করে না। নিশ্চিতভাবে কোন সংকীর্ণ স্বার্থই এরূপ শঠতা ও প্রতারণার প্ররোচনা দিয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যখন নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এহেন প্রতারণামূলক কাজ করে তখন গোপন করার যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজের কাজ কারবার বাড়াবার ও সম্প্রসারিত করার জন্য তাকে নানা ধরনের উপায় অবলম্বন করতে হয়। এসবের কুৎসিত দিকগুলো হাজার চেষ্টা করলেও আশপাশের সমাজে লুকিয়ে রাখা যায় না। তাছাড়া নিজের আধ্যাত্মবাদের ব্যবসায় ফেঁদে তার নিজের কিছু না কিছু লাভ হতে দেখা যায়। ভক্তদের থেকে নজরানা নেয়া হয়। লংগরখানা খোলা হয়। জমিজমা কেনা হয়। অলংকারাদি তৈরি করা হয়। ফকিরির আস্তানা দেখতে দেখতে বাদশাহের দরবারে পরিণত হয়। কিন্তু যেখানে এর বিপরীত নবুওয়াত দাবীকারীর ব্যক্তিগত জীবন এমন সব নৈতিক গুণাবলীতে পরিপূর্ণ দেখা যায়, যার মধ্যে প্রতারণামূলক উপায়ের নাম-নিশানাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না এবং এ কাজের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ তো দূরের কথা বরং এ সেবামূলক কাজের জন্য সে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দেয়, সেখানে মিথ্যাচারের সন্দেহ করার কোন সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না। কোন বুদ্ধিমান ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি একথা কল্পনাও করতে পারে না যে, একজন নিশ্চিন্ত জীবন যাপনকারী ভালো লোক কেন বিনা কারণে একটি মিথ্যা দাবী নিয়ে দাঁড়াবেন, যখন এ দাবীর মাধ্যমে তার কোন স্বার্থোদ্ধার হচ্ছে না বরং উলটো নিজের ধন-দৌলত, সময় ও শক্তিসামর্থ-শ্রম সবকিছু একাজে নিয়োগ করে এর বদলে সে সারা দুনিয়ার লোকদের শত্রুতা মাথা পেতে নিয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া মানুষের আন্তরিক হবার সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট প্রমাণ। বছরের পর বছর ধরে যখন কোন ব্যক্তি এ ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে যেতে থাকে তখন যে ব্যক্তি নিজেই অসৎ সংকল্পকারী একমাত্র সে-ই তার প্রতি অসৎসংকল্পকারী বা স্বার্থপর হবার দোষারোপ করতে পারে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনূন ৭০ টীকা)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝١١٠ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۝١١١

কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং (নির্দ্বিধায়) আমার আনুগত্য করো।[৮০] *তারা জবাব দিল, "আমরা কি তোমাকে মেনে নেবো, অথচ নিকৃষ্টতম লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে?"*[৮১]

৮০. অকারণে এ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। আগে এটি বলা হয়েছিল এক প্রেক্ষিতে, এখানে পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে ভিন্ন প্রেক্ষিতে। উপরে اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ এর সাথে فَاتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যাংশের সম্পর্ক এ ছিল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ব্যক্তি হচ্ছেন একজন আমানতদার রসূল, যার আমানতদারীর গুণ সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই অবগত, তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করতে গিয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর এখানে مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ এর সাথে এ বাক্যের সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত লাভ ছাড়াই যে ব্যক্তি নিছক মানুষের সংস্কার সাধনের জন্য পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে কাজ করছে তার উদ্দেশ্যকে অসৎ আখ্যায়িত করতে গিয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। এ কথাটির ওপর এত বেশী জোর দেবার কারণ ছিল এই যে, জাতির সরদাররা হযরত নূহের আন্তরিকতাপূর্ণ সত্যের দাওয়াতের মধ্যে খুঁত বের করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এ মর্মে অভিযোগ আনছিল যে, তিনি নিজের বড়াই করার জন্য এতসব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ঃ

يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ – (المؤمنون : ٢٤)

"সে তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়।"

৮১. হযরত নূহের দাওয়াতের এ জবাব যারা দিয়েছিল তারা ছিল তার সম্প্রদায়ের সরদার, মাতব্বর ও গণ্য মান্য ব্যক্তি। যেমন অন্যান্য জায়গায় এ কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ

"সে জাতির কাফের সরদাররা বললো, আমরা তো তোমাকে এ ছাড়া আর কিছুই দেখছি না যে, তুমি নিছক একজন মানুষ আমাদেরই মতো এবং আমরা দেখছি একমাত্র এমন সব লোকেরা না বুঝেই তোমার অনুসারী হয়েছে যারা আমাদের এখানে নিম্ন শ্রেণীর লোক। আর আমরা এমন কোন জিনিসই দেখি না যার বলে তোমরা আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ।" (হূদ ঃ ২৭ আয়াত)

এ থেকে জানা যায়, হযরত নূহের প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদের অধিকাংশ ছিল গরীব ও ক্ষুদ্র পেশাদার অথবা এমন পর্যায়ের যুবক জাতির মধ্যে যাদের কোন মর্যাদা ছিল না। অন্যদিকে ছিল উচ্চ শ্রেণীর বিত্তশালী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকেরা। তারা আদাপানি খেয়ে তাঁর বিরোধিতায় নেমেছিল এবং তারাই জাতির সাধারণ লোকদেরকে

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾

নূহ বললো, "তাদের কাজ কেমন, আমি কেমন করে জানবো। তাদের হিসেব গ্রহণ করা তো আমার প্রতিপালকের কাজ। হায়! যদি তোমরা একটু সচেতন হতে।[৮২] যে ঈমান আনে তাকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। আমি তো মূলত একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।[৮৩] তারা বললো, "হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তাহলে তুমি অবশ্যই বিপর্যস্ত লোকদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।"[৮৪] নূহ দোয়া করলো, "হে আমার রব! আমার জাতি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে।[৮৫]

নানাভাবে প্রতারিত করে নিজেদের দলভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এ প্রসংগে তারা হযরত নূহের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করছিল তার মধ্যে একটি যুক্তি ছিল নিম্নরূপ ঃ যদি নূহের দাওয়াতের কোন গুরুত্ব থাকতো, তাহলে জাতির প্রধানগণ, উলামায়ে কেরাম, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ তা গ্রহণ করতো। কিন্তু তাদের কেউ তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। জাতির হীনবল ও নিম্ন শ্রেণীর কিছু অবুঝ লোক তাঁর দলে ভিড়েছে। এ অবস্থায় আমাদের মতো উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা কি এসব অজ্ঞ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবে?

এ একই কথা কুরাইশ বংশীয় কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলতো। তারা বলতো, দাস ও দরিদ্র লোকেরা অথবা কয়েকজন অবুঝ ছোক্রাই তো এঁর অনুসারী। জাতির প্রধান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কেউ এঁর সাথে নেই। আবু সুফিয়ান হিরাকলের প্রশ্নের জবাবেও একথাই বলেছিলেন ঃ تبعه منا الضعفاء والمساكين (আমাদের গরীব ও দুর্বল লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হয়েছে।) তাদের চিন্তাধারা যেন এধরনের ছিলঃ জাতির প্রধানরা যাকে সত্য বলে মনে করে তা–ই একমাত্র সত্য। কারণ একমাত্র তারাই বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী। আর ছোট লোকদের ব্যাপারে বলা যায়, তাদের ছোট হওয়াই একথা প্রমাণ করে যে, তারা বুদ্ধিহীন ও দুর্বল সিদ্ধান্তের অধিকারী। তাই তাদের কোন কথা মেনে নেয়া এবং বড় লোকদের কথা প্রত্যাখ্যান করার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, সেটি একটি গুরুত্বহীন কথা। বরং মক্কার কাফেররা তো এর চাইতেও অগ্রসর হয়ে এ মর্মে যুক্তি পেশ করতো যে, কোন মামুলী ও সাধারণ লোক নবী হতে পারে না। আল্লাহ যদি সত্যিই কোন নবী পাঠাতে চাইতেন তাহলে কোন বড় সমাজপতিকে নবী করে পাঠাতেন ঃ

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ○

"তারা বলে, এ কুরআন আমাদের দু'টি বড় নগরীর (মক্কা ও তায়েফ) কোন প্রভাবশালী লোকের প্রতি নাযিল করা হলো না কেন?" (আয্ যুখরুফঃ ৩১আয়াত)।

৮২. এটি তাদের আপত্তির প্রথম জবাব। যেমন উপরে বলা হয়েছে, তাদের আপত্তির ভিত্তি ছিল একটি কাল্পনিক সিদ্ধান্তের ওপর। সেটি ছিল ঃ গরীব, শ্রমজীবী এবং যারা নিম্নশ্রেণীর কাজ করে অথবা যারা সমাজের নিম্নশ্রেণীর সাথে যুক্ত। তাদের কোন বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা থাকে না। তারা জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক শূন্য হয়। তাই তাদের ঈমান কোন চিন্তা ও দূরদৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের আকীদা বিশ্বাস নির্ভরযোগ্য নয়। তাদের কর্মকাণ্ডের কোন গুরুত্ব নেই। হযরত নূহ এর জবাবে বলেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে এসে ঈমান আনে এবং একটি আকীদা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী কাজ করতে থাকে তার একাজের পেছনে কোন্ ধরনের উদ্যোগ কাজ করছে এবং তা কতটুকু মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী তা জানার কোন মাধ্যম আমার কাছে নেই। এ বিষয়গুলো দেখা এবং এগুলোর হিসেব রাখা আল্লাহর কাজ, আমার ও তোমাদের নয়।

৮৩. এটি তাদের আপত্তির দ্বিতীয় জবাব। তাদের আপত্তির মধ্যে একথা প্রচ্ছন্ন ছিল যে, হযরত নূহের চারদিকে মু'মিনদের যে দলটি সমবেত হচ্ছে তারা যেহেতু আমাদের সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক, তাই উচ্চ শ্রেণীর কোন ব্যক্তি এ দলে শামিল হতে পারে না। অন্যকথায় তারা যেন একথা বলছিল, হে নূহ! তোমার প্রতি ঈমান এনে আমরা কি নিজেদেরকেও নিম্নশ্রেণীর নির্বোধদের দলভুক্ত করবো? আমরা কি দাস, চাকর-বাকর, শ্রমিক ও কায়িক পরিশ্রমকারীদের লাইনে এসে বসে যাবো? হযরত নূহ এর জবাব এভাবে দেন, যারা আমার কথা মানে না আমি তাদের পেছনে দৌড়াতে থাকবো এবং যারা আমার কথা মেনে নেয় তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবো, এ ধরনের অযৌক্তিক কর্মনীতি আমি কেমন করে অবলম্বন করতে পারি! আমার অবস্থা এমন এক ব্যক্তির মতো যে দাঁড়িয়ে সোচ্চার কণ্ঠে একথা ঘোষণা করে দিয়েছে যে, তোমরা মিথ্যা ও বাতিলের পথে চলছো। এ পথে চলার পরিণাম ধ্বংস। আমি তোমাদের যে পথ দেখাচ্ছি তার মধ্যেই রয়েছে তোমাদের সবার সাফল্য ও মুক্তি। এখন যে চাও আমার এ সতর্কবাণী গ্রহণ করে সোজা পথে চলে এসো এবং যে চাও চোখ বন্ধ করে ধ্বংসের পথে চলতে থাকো। আমি তো এমন কোন কর্মনীতি অবলম্বন করতে পারি না যার ফলে যে সমস্ত আল্লাহর বান্দা আমার এ সতর্কবাণী শুনে সঠিক সোজা পথ অবলম্বন করার জন্য আমার কাছে আসবে আমি তাদের জাতি, গোত্র, বংশ, পেশা জিজ্ঞেস করবো এবং যদি তারা তোমাদের দৃষ্টিতে "নিম্নশ্রেণীর" হয়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে "অভিজাত" লোকেরা কবে ধ্বংসের পথ ছেড়ে দিয়ে নাজাতের পথে এগিয়ে আসবে সে আশায় বসে থাকবো।

ঠিক এ একই ব্যাপার চলছিল এ আয়াতগুলো নাযিল হবার সময় মক্কার কাফের সমাজ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে। এ জিনিসটি সামনে রাখলে হযরত নূহ ও তাঁর জাতির সরদারদের এ কথোপকথন এখানে শুনানো হচ্ছে কেন তা বুঝা যেতে পারে। মক্কার কাফেরদের বড় বড় সরদার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, আমরা এই বেলাল, আম্মার, সুহাইবের মতো গোলাম এবং শ্রমজীবী মানুষদের সাথে

কেমন করে বসতে পারি। তাদের কথার অর্থ যেন এ ছিল যে, মুমিনদের দল থেকে যদি এ গরীবদেরকে বের করে দেয়া হয় তাহলেই না এ অভিজাতদের ওদিক মুখো হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। অন্যথায় সুলতান মাহমুদ ও তার ভৃত্য আয়াযের এক কাতারে দাঁড়ানো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ নির্দেশ দেয়া হয়, যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এমন সব অহংকারীদের জন্য ঈমান গ্রহণকারী গরীবদেরকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে নাঃ

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ○ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ○ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ○ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ○ وَهُوَ يَخْشَىٰ ○ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ○ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ○ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ○

"হে মুহাম্মাদ! যে বেপরোয়া ভাব দেখালো তুমি তার প্রতি মনোযোগী হলে? অথচ যদি সে সংশোধিত না হয়, তাহলে তোমার ওপর তার কি দায়িত্ব আছে? আর যে ব্যক্তি মনে আল্লাহর ভয় নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসে তুমি তাকে অবজ্ঞা করছো? কখখনো না, এতো একটি উপদেশ, যার মন চায় একে গ্রহণ করে নেবে।" (সূরা আবাসাঃ ৫-১২ আয়াত)

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ط مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّٰلِمِينَ ○ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ط أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِالشّٰكِرِينَ ○

"যারা দিনরাত নিজেদের রবকে ডাকছে নিছক তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করো না। তোমার ওপর তাদের কোন দায়দায়িত্ব নেই এবং তাদের ওপরও তোমার কোন দায়দায়িত্ব নেই। এরপরও যদি তুমি তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করো তাহলে তুমি জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। আমি তো এভাবে তাদের মধ্য থেকে কতককে কতকের মাধ্যমে পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছি, যাতে তারা বলেঃ 'আমাদের মধ্যে কি কেবল এ লোকেরাই অবশিষ্ট ছিল, যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে?' হ্যাঁ, আল্লাহ নিজের কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে কি এরচেয়ে বেশী জানেন না?" (আল আন'আমঃ ৫২ আয়াত)

৮৪. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ -এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, তোমাকে 'রজম' করা হবে। অর্থাৎ পাথর মেরে তোমাকে মেরে ফেলা হবে।

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

এখন আমার ও তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ফায়সালা করে দাও এবং আমার সাথে যেসব মু'মিন আছে তাদেরকে রক্ষা করো।[৮৬] *শেষ পর্যন্ত আমি একটি বোঝাই করা নৌযানে তাকে ও তার সাথিদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম,*[৮৭] *তারপর অবশিষ্ট লোকদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।*

নিশ্চিতভাবে এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। আর আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমার রব পরাক্রমশালী এবং করুণাময়ও।

আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, চারদিক থেকে তোমাকে গালাগালি করা হবে। যেখানেই যাবে, অভিশাপ দেয়া হবে এবং অপদস্ত করে তাড়িয়ে দেয়া হবে। আরবী বাগধারা অনুযায়ী এ শব্দগুলো থেকে এ দু'টি অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮৫. অর্থাৎ চূড়ান্ত ও শেষ পর্যায়ে মিথ্যা বলে দিয়েছে ও প্রত্যাখ্যান করেছে। এরপরে আর কোন প্রকার সত্যায়ন করার ও ঈমান আনার আশা থাকে না। আলোচনার বাইরের চেহারা দেখে কেউ যেন এ সন্দেহ পোষণ না করে যে, নবী ও তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারদের মধ্যে উপরের কথোপকথন হয় এবং তাদের পক্ষ থেকে প্রথম প্রত্যাখ্যানের পর নবী আল্লাহর কাছে এ মর্মে রিপোর্ট পেশ করেন যে, তারা আমার নবুওয়াত মানছে না কাজেই এখন আপনি আমার ও তাদের সমস্যার ফায়সালা করে দিন। হযরত নূহের (আ) দাওয়াত এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কুফরীর ওপর অবিচল থাকার মধ্যে যে শত শত বছর ধরে সুদীর্ঘকালীন সংঘাত চলেছে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তা আলোচিত হয়েছে। সূরা আনকাবূতে বলা হয়েছে, সাড়ে নয় শত বছর ধরে এ সংঘাত চলেঃ

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا –

"তারপর তিনি তাদের মধ্যে বসবাস করেন সাড়ে নয় শত বছর।" (১৪ আয়াত)

এ দীর্ঘ সময়ে হযরত নূহ বংশ পরম্পরায় তাদের সামাজিক কার্যক্রম দেখে বুঝতে পারেন যে, কেবল তাদের মধ্যেই সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা খতম হয়ে যায়নি। বরং তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যেও সৎ ও ঈমানদার মানুষের জন্ম হবার আশা নেই।

كَذَّبَتْ عَادُ ۣالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٦﴾ وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٧﴾ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾

৭ রুকূ'

আদ জাতি রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।[৮৮] স্মরণ করো যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বলেছিল,[৮৯] "তোমরা ভয় করছো না? আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি এ কাজে তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের। তোমাদের এ কি অবস্থা, প্রত্যেক উঁচু জায়গায় অনর্থক একটি ইমারত বানিয়ে ফেলছো[৯০] এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছো, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে?[৯১] আর যখন কারো ওপর হাত ওঠাও প্রবল একনায়ক হয়ে হাত ওঠাও।[৯২] কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْۤا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ○

"হে পরওয়ারদিগার! যদি তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও, তাহলে তারা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করবে এবং তাদের বংশে যে-ই জন্ম নেবে সে-ই হবে চরিত্রহীন ও কঠোর সত্য অস্বীকারকারী।" (নূহ, ২৭ আয়াত)

আল্লাহ নিজেও হযরত নূহের এ অভিমতকে সঠিক বলে স্বীকার করেন এবং নিজের পূর্ণ ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেনঃ

لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

"তোমার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া এখন আর ঈমান আনার মত কেউ নেই। কাজেই এখন তাদের কার্যকলাপের জন্য দুঃখ করা থেকে বিরত হও।" (হূদ, ৩৬ আয়াত)

৮৬. অর্থাৎ কেবল কে সত্য ও কে মিথ্যা এতটুকু ফায়সালা করে দিলে হবে না বরং এ ফায়সালাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করো যাতে মিথ্যাপন্থীকে ধ্বংস করে দেয়া যায়

এবং সত্যপন্থীকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। "আমার ও আমার মুমিন সাথীদেরকে রক্ষা করো" এ শব্দগুলো স্বতস্ফূর্তভাবে এ অর্থ প্রকাশ করছে যে, অবশিষ্ট লোকদের প্রতি আযাব নাযিল করো এবং ধরার বুক থেকে তাদেরকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দাও।

৮৭. "বোঝাই করা নৌযান" অর্থ হচ্ছে, এ নৌকাটি সকল মু'মিন ও সকল প্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল। পূর্বেই এ প্রাণীদের এক একটি জোড়া সংগে নেবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা হূদ ৪০ আয়াত।

৮৮. তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য দেখুন আল আ'রাফ ৬৫–৭২ ও হূদ ৫০–৬০ আয়াত। এ ছাড়া এ কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত স্থানগুলো পড়ুন ঃ হা–মীম আস্ সাজ্‌দাহ ১৩–১৬, আল আহকাফ ২১–২৬, আয্ যারিয়াত ৪১–৪৫, আল কামার ১৮–২২, আল হাক্কাহ ৪–৮ এবং আল ফজর ৬–৮ আয়াত।

৮৯. হযরত হূদের এ ভাষণটি অনুধাবন করার জন্য এ জাতিটি সম্পর্কিত তথ্যাবলী আমাদের সামনে থাকা প্রয়োজন। কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে আমাদের কাছে এ তথ্য পরিবেশন করেছে। এতে বলা হয়েছে, নূহের জাতির ধ্বংসের পর দুনিয়ায় যে জাতির উত্থান ঘটানো হয়েছিল তারা ছিল এই আদ জাতি ঃ

وَاذْكُرُوٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ –

"স্মরণ করো (আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানের কথা) তিনি নূহের জাতির পরে তোমাদেরকে খলীফা তথা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন।" (আল আ'রাফ ৬৯ আয়াত)

শারীরিক দিক দিয়ে তারা ছিল অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ জাতি।

وَزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً –

"আর শারীরিক গঠন শৈলীতে তোমাদেরকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করি।" (আল আ'রাফ ৬৯ আয়াত)

সেকালে তারা ছিল নজিরবিহীন জাতি। তাদের সমকক্ষ অন্য কোন জাতিই ছিল নাঃ

الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ –

"তাদের সমকক্ষ কোন জাতি দেশে সৃষ্টি করা হয়নি।" (আল ফজর ৮ আয়াত)

তাদের সভ্যতা ছিল বড়ই উন্নত ও গৌরবোজ্জ্বল। সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করা ছিল তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট এবং এজন্য তদানীন্তন বিশ্বে তারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ – اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ –

"তুমি কি দেখোনি তোমাদের রব কি করেছেন সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী ইরমের আদদের সাথে?" (আল ফজর ৬–৭ আয়াত)

এ বস্তুগত উন্নতি ও শারীরিক শক্তি তাদেরকে অহংকারী করে দিয়েছিল এবং নিজেদের শক্তির গর্বে তারা মত্ত হয়ে উঠেছিলঃ

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً –

"আর আদ জাতি, তারা তো পৃথিবীতে সত্যের পথ থেকে সরে গিয়ে অহংকার করতে থাকে এবং বলতে থাকে, কে আছে আমাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী?" (হা–মীম আস্ সাজদাহ ১৫ আয়াত)

তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল কয়েকজন বড় বড় জালেম একনায়কের হাতে। তাদের সামনে কেউ টু শব্দটিও করতে পারতো নাঃ

وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ –

"আর তারা প্রত্যেক সত্যের দুশমন জালেম একনায়কের হুকুম পালন করে।" (হূদ ৫৯ আয়াত)

ধর্মীয় দিক থেকে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না বরং শির্কে লিপ্ত ছিল। বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত, একথা তারা অস্বীকার করতোঃ

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا –

"তারা (হুদ আলাইহিস সালামকে) বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছো যে, আমরা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করবো এবং আমাদের বাপদাদারা যাদের ইবাদাত করতো তাদেরকে বাদ দেবো?" (আল আ'রাফ ৭০ আয়াত)

এ বৈশিষ্টগুলো সামনে রাখলে হযরত হূদের দাওয়াতের এ ভাষণ ভালোভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে।

৯০. অর্থাৎ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সমৃদ্ধির প্রদর্শনী করার উদ্দেশ্যে এমনসব বিশাল সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করছো; যেগুলোর কোন প্রয়োগ ক্ষেত্র ও প্রয়োজনীয়তা নেই এবং নিছক তোমাদের সম্পদশালিতা ও শানশওকতের প্রদর্শনীর নিদর্শন হিসেবে এগুলো টিকে থাকবে, এছাড়া যেগুলোর কোন উপযোগিতাও নেই।

৯১. অর্থাৎ তোমাদের অন্যান্য ইমারতগুলো ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেগুলোকে সুরম্য, কারুকার্যময় ও সুদৃঢ় করার ব্যাপারে তোমরা এতবেশী অর্থ, শ্রম ও যোগ্যতা নিয়োগ করছো যেন তোমরা এ দুনিয়ায় চিরকাল বসবাস করার ব্যবস্থা করছো, যেন শুধুমাত্র এখানকার আয়েশ আরামের ব্যবস্থা করাই তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ এবং এছাড়া আর কোন কথাই চিন্তা করার নেই।

এ প্রসংগে একথাও মনে রাখতে হবে যে, অপ্রয়োজনে বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করা এমন কোন বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড নয়, যার প্রকাশ কোন জাতির মধ্যে এভাবে হতে পারে যে, তার অন্য সমস্ত কাজ কারবার তো ভালোই শুধুমাত্র এ একটি খারাপ ও ভুল কাজ সে করেছে। এ অবস্থা একটি জাতির মধ্যে সৃষ্টিই হয় এমন এক সময় যখন একদিকে তার মধ্যে দেখা দেয় সম্পদের প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে প্রবৃত্তি পূজা ও

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

তাঁকে ভয় করো যিনি এমন কিছু তোমাদের দিয়েছেন যা তোমরা জানো। তোমাদের দিয়েছেন পশু, সন্তান–সন্ততি, উদ্যান ও পানির প্রস্রবনসমূহ। আমি ভয় করছি তোমাদের ওপর একটি বড়দিনের আযাবের।" তারা জবাব দিল, "তুমি উপদেশ দাও বা না দাও, আমাদের জন্য এ সবই সমান। এ ব্যাপারগুলো তো এমনিই ঘটে চলে আসছে[৯৩] *এবং আমরা আযাবের শিকার হবো না।" শেষ পর্যন্ত তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম।*[৯৪]

নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে আছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মেনে নেয়নি। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব যেমন পরাক্রমশালী তেমন করুণাময়ও।

বৈষয়িক স্বার্থপরতা প্রবল হতে হতে উন্মত্ততার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যখন কোন জাতির মধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন তার সভ্যতা–সংস্কৃতির সমগ্র ব্যবস্থাটিই পচে দুর্গন্ধময় হয়ে পড়ে। হযরত হূদ (আ) তাঁর জাতির ইমারত নির্মাণের যে সমালোচনা করেন তার উদ্দেশ্য এ ছিল না যে, তিনি শুধুমাত্র তাদের এ ইমারত নির্মাণকেই আপত্তিকর মনে করতেন বরং তিনি সামগ্রিকভাবে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকৃতির সমালোচনা করছিলেন এবং এ ইমারতগুলোর কথা তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করেছিলেন যেন সারা দেশে সর্বত্র এ বড় বড় ফোড়াগুলো সেই বিকৃতির সবচেয়ে সুস্পষ্ট আলামত হিসেবে পরিদৃষ্ট হচ্ছে।

৯২. অর্থাৎ নিজেদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে তোমরা এত বেশী সীমা–লংঘন করে গেছো যার ফলে মনে হয়েছে তোমাদের বাসগৃহ নয়, সুদৃশ্য মহল ও প্রাসাদের প্রয়োজন। আর এতেও পরিতৃপ্ত না হয়ে তোমরা অপ্রয়োজনে সুউচ্চ নয়নাভিরাম ইমারতসমূহ নির্মাণ করছো। শক্তি ও সম্পদের প্রদর্শনী ছাড়া এগুলোর আর কোন স্বার্থকতা নেই। কিন্তু তোমাদের মনুষ্যত্বের মানদণ্ড এত নিচে নেমে গেছে, যার ফলে দুর্বলদের জন্য তোমাদের অন্তরে একটুও দয়া মায়া নেই। গরীবদের জন্য তোমাদের দেশে কোন ইনসাফ নেই। আশপাশের দুর্বল জাতিগুলো হোক বা তোমাদের নিজেদের দেশের পশ্চাতপদ শ্রেণীগুলো, সবাই তোমাদের জুলুম নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং তোমাদের নির্মম নির্যাতনের হাত থেকে কেউ রেহাই পাচ্ছে না।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤١﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٢﴾ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٤٤﴾ وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٥﴾ اَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَاۤ اٰمِنِيْنَ ﴿١٤٦﴾ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٤٧﴾ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٥٠﴾

৮ রুকূ'

সামূদ জাতি রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।[৯৫] স্মরণ করো যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বললোঃ "তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল।[৯৬] কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের। এখানে যেসব জিনিস আছে সেগুলোর মাঝখানে কি তোমাদের এমনিই নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়া হবে?[৯৭] এসব উদ্যান ও প্রস্রবনের মধ্যে? এসব শস্যক্ষেত ও রসাল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানের মধ্যে?[৯৮] তোমরা পাহাড় কেটে তার মধ্যে সগর্বে ইমারত নির্মাণ করছো।[৯৯] আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

৯৩. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, যা কিছু আমরা করছি এগুলো কোন নতুন জিনিস নয়, শত শত বছর থেকে আমাদের বাপ–দাদারা এসব করে আসছে। এসবই ছিল তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, চরিত্রনীতি ও ব্যবহারিক জীবনধারা। তাদের ওপর এমন কি বিপদ নেমে এসেছিল যে, আজ আমাদের ওপর তা নেমে আসার আশংকা করবো? এ জীবন ধারায় যদি কোন অন্যায় ও দুষ্কৃতির অংশ থাকতো, তাহলে তুমি যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা আগেই নেমে আসতো। দুই, তুমি যেসব কথা বলছো এমনি ধারার কথা ইতিপূর্বেও বহু ধর্মীয় উন্মাদ এবং যারা নৈতিকতার বুলি আওড়ায় তারা আওড়িয়ে এসেছে। কিন্তু দুনিয়ার রীতি অপরিবর্তিত রয়েছে। তোমাদের মতো লোকদের কথা না মানার ফলে কখনো এক ধাক্কায় এ রীতির মধ্যে ওলট পালট হয়ে যায়নি।

৯৪. এ জাতির ধ্বংসের যে বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে এসেছে তা হচ্ছে এইঃ হঠাৎ প্রবল ঘূর্ণিঝড় ওঠে। লোকেরা দূর থেকে নিজেদের উপত্যকার দিকে, এ ঘূর্ণিঝড় আসতে দেখে মনে করে মেঘ ছেয়ে যাচ্ছে। তারা আনন্দে উতলা হয়ে ওঠে। কারণ জোর বৃষ্টিপাত হবে। কিন্তু তা ছিল আল্লাহর আযাব। আট দিন ও সাত রাত পর্যন্ত এমন ঝড়ো

হাওয়া অনবরত বইতে থাকে যার ফলে প্রত্যেকটি জিনিসই ধ্বংস হয়ে যায়। হাওয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে মানুষজনকে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে চতুরদিকে নিক্ষেপ করতে থাকে। বাতাস এত বেশী গরম ও শুকনা ছিল যে, যার ওপর দিয়ে তা একবার প্রবাহিত হয় তাকে নড়বড়ে ও অকেজো করে দিয়ে যায়। এ জালেম জাতির প্রত্যেকটি লোক খতম না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এ ঝড় থামেনি। তাদের জনপদের ধ্বংসাবশেষগুলোই শুধু তাদের পরিণামের কাহিনী শুনাবার জন্য টিকে আছে। আর আজ এ ধ্বংসাবশেষও নেই। আহকাফের সমগ্র এলাকা একটি ভয়াবহ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আহকাফ ২৫ টীকা)।

৯৫. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ ৭৩–৭৯ আয়াত, হূদ ৬১–৬৮ আয়াত, আল হিজর ৮০–৮৪ আয়াত এবং বনী ইসরাঈল ৫৯ আয়াত। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত স্থানগুলোঃ আন্ নমল ৪৫–৫৯, আয্ যারিয়াত ৪৩–৪৫, আল কামার ২৩–৩১, আল হাক্কাহ ৪–৫, আল ফজর ৯ এবং আশ্ শাম্স ১১ আয়াত।

এ জাতিটি সম্পর্কে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, আদ জাতির পরে দুনিয়ায় এ সামূদ জাতিই উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। (الاعراف : ٧٤) – جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ । কিন্তু তাদের সভ্যতার অগ্রগতিও শেষ পর্যন্ত আদ জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির মতো একই রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ জীবন যাত্রার মান উন্নত থেকে উন্নততর এবং মনুষ্যত্বের মান নিম্নতর থেকে নিম্নতর হতে থাকে। এক দিকে সমতল এলাকায় সুউচ্চ ও সুরম্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং পার্বত্য এলাকায় অজন্তা–ইলোরার পর্বত গুহার মতো সুরম্য প্রাসাদ নির্মিত হতে থাকে। আর অন্যদিকে সমাজে শির্ক ও মূর্তি পূজার প্রবল জোয়ার চলতে থাকে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠ ভরে উঠতে থাকে জুলুম–নিপীড়নের প্রাবল্যে। জাতির সবচেয়ে অসৎ দুষ্কৃতিকারীরা তার নেতৃত্বের আসনে বসেছিল। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত ছিল। হযরত সালেহের সত্যের দাওয়াত কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর দুর্বল লোকদেরকেই প্রভাবিত করছিল। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা শুধুমাত্র একারণেই তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল যে, إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ

"যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো তা আমরা মেনে নিতে পারি না।"

৯৬. হযরত সালেহের বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী এবং অসাধারণ যোগ্যতার সাক্ষ তাঁর জাতির লোকদের মুখ দিয়ে কুরআন মজীদের ভাষায় নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত হয়েছেঃ

قَالُوْا يٰصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا –

"তারা বললো, হে সালেহ! এর আগে তুমি আমাদের মধ্যে এমন লোক ছিলে যার ওপর আমাদের অনেক আশা ভরসা ছিল।" (হূদ ৬২ আয়াত)

৯৭. অর্থাৎ তোমরা কি মনে করো, তোমাদের এ আয়েশ আরাম স্থায়ী ও চিরন্তন? এসব কোনদিন বিনষ্ট হবে না? তোমাদের থেকে কখনো এসব নিয়ামতের হিসেব নেয়া হবে না? তোমরা যেসব কাজ কারবার করে যাচ্ছো কখনো এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না?

৯৮. মূলে هَضِيْمٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে খেজুরের এমন কাঁদি যা ফলভারে নুয়ে পড়েছে এবং যার ফল পেকে যাবার পর রসাল ও কোমল হবার কারণে ফেটে যায়।

৯৯. আদ জাতির সভ্যতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিল, তারা উঁচু উঁচু স্তম্ভ বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণ করতো। ঠিক তেমনি সামূদ জাতির সভ্যতা তার যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টের জন্য প্রাচীনকালের জাতিসমূহের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তা ছিল এই যে, তারা পাহাড় কেটে তার মধ্যে ইমারত নির্মাণ করতো। তাই সূরা 'আল ফজ্‌রে' যেভাবে আদকে 'যাতুল ইমাদ' (ذات العماد) অর্থাৎ স্তম্ভের অধিকারী পদবী দেয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি সামূদ জাতির বর্ণনা একথার মাধ্যমে করা হয়েছেঃ اَلَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ "এমনসব লোক যারা উপত্যকায় পাহাড় কেটেছে।" এ ছাড়া কুরআনে একথাও বলা হয়েছে যে, তারা নিজেদের দেশের সমতলভূমিতে বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করতোঃ

تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا - (الاعراف : ٧٤)

এসব গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল? فٰرِهِيْنَ শব্দের মাধ্যমে কুরআন–এর ওপর আলোকপাত করে। অর্থাৎ এসব কিছু ছিল তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব, সম্পদ, শক্তি ও প্রযুক্তির নৈপুণ্যের প্রদর্শনী। কোন যথার্থ প্রয়োজনের তাগিদ এর পেছনে কার্যকর ছিল না। একটি বিকৃত ও ভ্রষ্ট সভ্যতার ধরন এমনিই হয়ে থাকে। একদিকে সমাজের গরীব লোকেরা মাথা গোঁজারও ঠাঁই পায় না আর অন্যদিকে ধনী নেতৃস্থানীয় লোকেরা থাকার জন্য যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাসাদ নির্মাণ করে ফেলে তখন প্রয়োজন ছাড়াই নিছক লোক দেখাবার জন্য স্মৃতিস্তম্ভসমূহ নির্মাণ করতে থাকে।

সামূদ জাতির এ ইমারতগুলোর কিছু সংখ্যক এখনো টিকে আছে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি নিজে এগুলো দেখেছি। পাশের পৃষ্ঠায় এগুলোর কিছু ছবি দেয়া হলো। এ জায়গাটি মদীনা তাইয়েবা ও তাবুকের মধ্যবর্তী হিজাযের বিখ্যাত আল'উলা নামক স্থান (যাকে নবীর জমানায় 'ওয়াদিউল কুরা' বলা হতো) থেকে কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা আজো এ জায়গাকে 'আল্ হিজ্‌র' ও 'মাদ্‌য়ানে সালেহ' নামে স্মরণ করে থাকে। এ এলাকায় 'আল্‌উলা' এখনো একটি শস্যশ্যামল উপত্যকা। এখানে রয়েছে বিপুল সংখ্যক পানির নহর ও বাগিছা। কিন্তু আল্ হিজ্‌রের আশেপাশে বড়ই নির্জন ও ভীতিকর পরিবেশ বিরাজমান। লোকবসতি নামমাত্র। সবুজের উপস্থিতি ক্ষীণ। কূয়া আছে কয়েকটি। এরই মধ্য থেকে একটি কূয়ার ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের মধ্যে একথা প্রচলিত আছে যে, হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের উটনী সেখান থেকে পানি পান করতো। বর্তমানে এটি তুর্কী আমলের একটি বিরান ক্ষুদ্র সামরিক চৌকির মধ্যে অবস্থিত। কূয়াটি একেবারেই শুকনা। (এর ছবিও পাশের পাতায় দেখানো হয়েছে)। এ এলাকায় প্রবেশ করে আলউলা'র কাছাকাছি পৌঁছুতেই আমরা সর্বত্র এমনসব পাহাড় দেখলাম যা একেবারেই ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পরিষ্কার মনে হচ্ছিল, কোন ভয়াবহ ভূমিকম্প এগুলোকে নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত ঝাঁকানি দিয়ে ফালি ফালি করে দিয়ে গেছে। (এ পাহাড়গুলোরও কিছু ছবি পাশের পাতাগুলোয় দেয়া হয়েছে)। এ ধরনের

আল আলা পাহাড়

মাদয়ানে সালেহ (আ) পাহাড়

মাদয়ানে সালেহ (আ)-এর কিছু সংখ্যক সামূদীয় অট্টালিকা

মাদয়ানে সালেহ (আ)-এর সামুদীয় অট্টালিকা
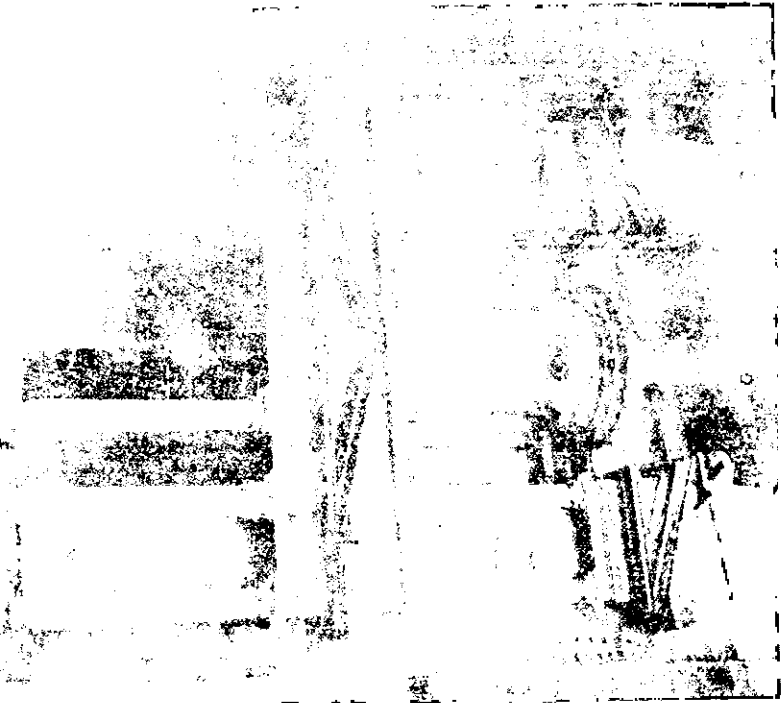
পেট্রায় নিবতী পদ্ধতির একটি অট্টালিকা

// ১১২

মাদয়ানে সালেহ (আ)—এর কিছু সংখ্যক সামুদীয় অট্টালিকা

পেট্রায় নিবতী পদ্ধতির একটি অট্টালিকা
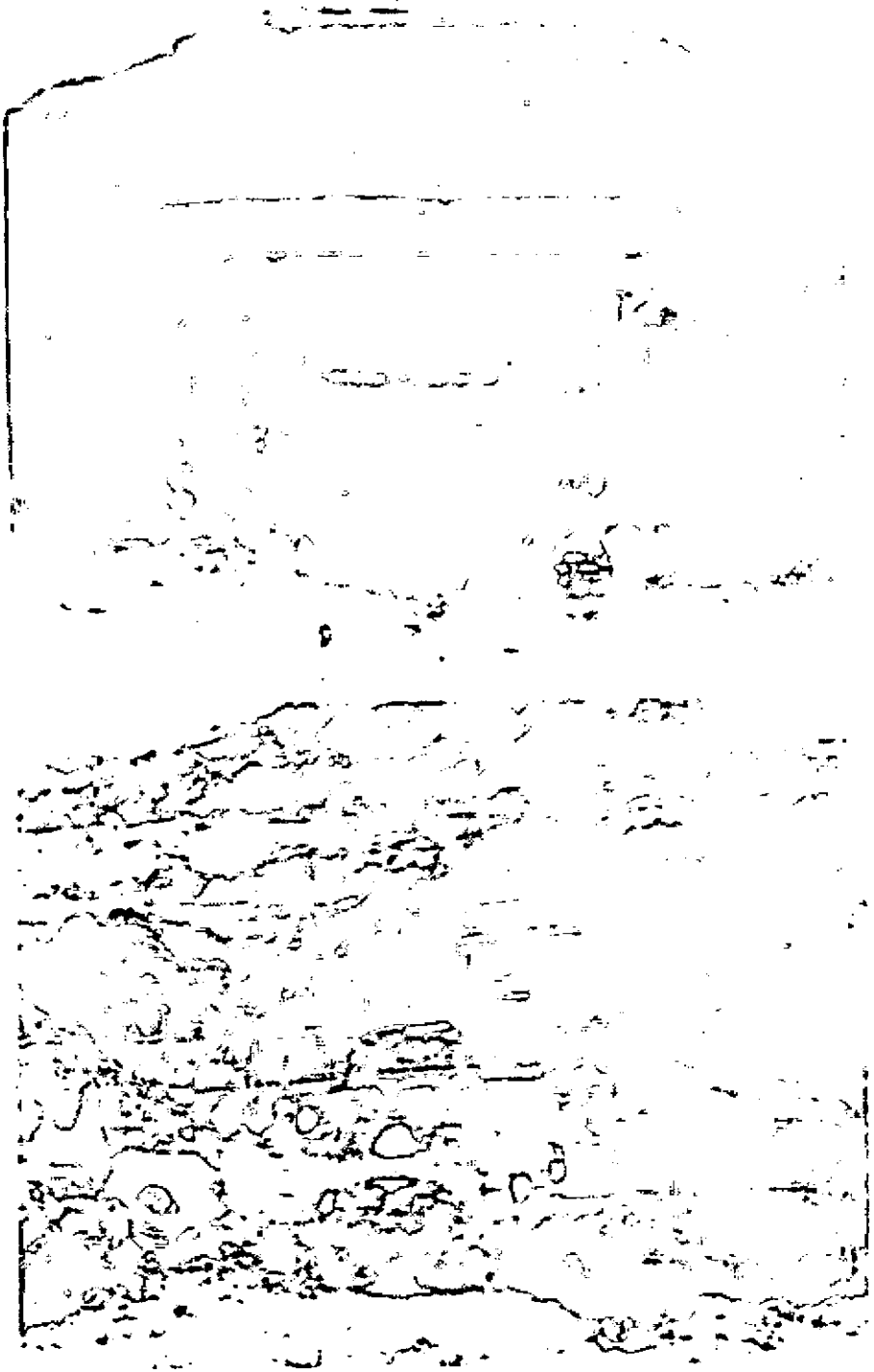
মাদয়ানে সামূদীয় পদ্ধতির একটি অট্টালিকা

মাদয়ানে সালেহ (আ)-এর উষ্ট্রী যে কূপে পানি পান করত

وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا۟ نَٰدِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

যেসব লাগামহীন লোক পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কোন সংস্কার সাধন করে না তাদের আনুগত্য করো না।"[১০০] তারা জবাব দিল, "তুমি নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।[১০১] তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কি? কোন নিদর্শন আনো, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।"[১০২] সালেহ বললো, "এ উটনীটি রইলো।[১০৩] এর পানি পান করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট এবং তোমাদের সবার পানি পান করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট রইলো।[১০৪] একে কখনো পীড়ন করো না, অন্যথায় একটি মহা দিবসের আযাব তোমাদের ওপর আপতিত হবে।" তারা তার পায়ের গিঁঠের রগ কেটে দিল[১০৫] এবং শেষে অনুতপ্ত হতে থাকলো। আযাব তাদেরকে গ্রাস করলো।[১০৬]

নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মান্যকারী নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব হচ্ছেন পরাক্রমশালী এবং দয়াময়ও।

পাহাড় আমরা দেখতে দেখতে গিয়েছি পূর্বের দিকে আল'উলা থেকে খয়বর যাবার সময় প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত এবং উত্তর দিকে জর্দান রাজ্যের সীমানার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত। এর অর্থ দাঁড়ায়, তিন চারশো মাইল দীর্ঘ ও একশো মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট একটি এলাকা ভূমিকম্পে একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আল হিজ্‌রে আমরা সামূদ জাতির যেসব ইমারত দেখেছিলাম ঠিক একই ধরনের কতিপয় ইমারত আমরা পেলাম আকাবা উপসাগরের কিনারে মাদ্‌য়ানে এবং জর্দান রাজ্যের পেট্রা (PETRA) নামক স্থানেও। বিশেষ করে পেট্রায় সামূদী প্যাটার্নের ইমারত এবং নিবতীদের তৈরি করা অট্টালিকা পাশাপাশি দেখা গেছে। এগুলোর আকৃতি, কারুকাজ ও নির্মাণ পদ্ধতিতে এত সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক নজর

দেখার সাথে সাথেই বুঝতে পারবে এগুলো এক যুগেরও নয় এবং একই জাতির স্থাপত্যের নিদর্শনও নয়। (এগুলোরও আলাদা আলাদা ছবি আমি পাশের পৃষ্ঠায় দিয়েছি। ইংরেজ প্রাচ্যবিদ ডটি (Daughty) কুরআনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আল হিজ্রের ইমারত সম্পর্কে দাবী করেছেন, এগুলো সামূদের নির্মিত নয় বরং নিবতীদের তৈরী ইমারত। কিন্তু উভয় জাতির স্থাপত্য পদ্ধতির মধ্যে বিস্তর ও সুস্পষ্ট ফারাক দেখা যায়। ফলে কেবলমাত্র একজন অন্ধই এগুলোকে একই জাতির নির্মিত বলে দাবী করতে পারে। আমার অনুমান, পাহাড় কেটে তার মধ্যে গৃহ নির্মাণ কৌশল সামূদই উদ্ভাবন করে এবং এর হাজার হাজার বছর পরে নিবৃতীরা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে একে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছিয়ে দেয়। অতপর ইলোরায় (পেট্রার প্রায় সাতশো বছর পরে নির্মিত গুহা) এ শিল্পটির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

১০০. অর্থাৎ তোমাদের যেসব রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং শাসকদের নেতৃত্বে এ ভ্রান্ত বিকৃত জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তাদের আনুগত্য পরিহার করো। এরা সব লাগাম ছাড়া। নৈতিকতার সমস্ত সীমা-লংঘন করে এরা লাগামহীন পশুতে পরিণত হয়েছে। এদের দ্বারা সমাজ-সভ্যতার কোন সংস্কার হতে পারে না। এরা যে ব্যবস্থা পরিচালনা করবে তার মধ্যে বিকৃতিই ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের জন্য কল্যাণের কোন পথ যদি থাকে তাহলে তা কেবলমাত্র এই একটিই। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করো এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আনুগত্য পরিহার করে আমার আনুগত্য করো। কারণ আমি আল্লাহর রসূল। আমার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তোমরা পূর্ব থেকেই অবগত আছো। আমি একজন নিস্বার্থ ব্যক্তি। নিজের কোন ব্যক্তিগত লাভের জন্য আমি এ সংস্কারমূলক কাজে হাত দেইনি-এ ছিল হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের ঘোষণাপত্রের সংক্ষিপ্তসার। নিজের জাতির সামনে তিনি এটি পেশ করেছিলেন। এর মধ্যে শুধু ধর্মীয় প্রচারণাই ছিল না বরং একই সঙ্গে তামাদ্দুনিক ও নৈতিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের দাওয়াতও ছিল।

১০১. "যাদুগ্রস্ত" অর্থাৎ দিওয়ানা ও পাগল তথা যার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। প্রাচীনকালের ধারণা অনুযায়ী জিনের বা যাদুর প্রভাবে পাগলামি দেখা দেয়। তাই তারা যাকে পাগল বলতে চাইতো তাকে বলতো "মাজ্নুন" (জিনগ্রস্ত) বা "মাস্হুর" (যাদুগ্রস্ত) ও মুসাহ্হার।

১০২. অর্থাৎ আমরা তোমাকে আল্লাহর প্রেরিত বলে মেনে নেব বাহ্যত তোমার ও আমাদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্যমূলক চিহ্ন তো আমরা দেখছি না। কিন্তু যদি তুমি নিজেকে আল্লাহর নিযুক্ত ও তাঁর প্রেরিত বলে দাবী কর এবং সেই দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে এমন কোন চাক্ষুস মু'জিযা পেশ করো, যা থেকে এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এবং পৃথিবী ও আকাশের মালিক মহান আল্লাহ যে তোমাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন সে ব্যাপারে আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায়।

১০৩. মু'জিযার দাবীর জবাবে উটনী হাজির করার ফলে পরিষ্কার বুঝা যায়, সেটি নিছক সেখানে সাধারণ আরবদের কাছে যেমন উটনী পাওয়া যেতো সে ধরনের একটি সাধারণ উটনী ছিল না। বরং মু'জিযা দেখাবার দাবীর জবাবে পেশ করা যায় এমন কোন জিনিস নিশ্চয়ই তার জন্ম ও প্রকাশ বা সৃষ্টির মধ্যে ছিল। যদি হযরত সালেহ তাদের দাবীর জবাবে এমনই কোন একটি সাধারণ উটনী ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিতেন তাহলে

এটা হতো অবশ্যই একটি অর্থহীন কাজ। কোন নবী তো দূরের কথা একজন সাধারণ বিবেকবান ব্যক্তির কাছ থেকেও এ ধরনের আচরণ আশা করা যেতে পারে না। এখানে তো একথা শুধুমাত্র বক্তব্যের প্রেক্ষাপট থেকেই অনুধাবন করা যায়। কিন্তু অন্যান্য স্থানে কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় এ উটনীর অস্তিত্বকে মু'জিযা গণ্য করা হয়েছে। সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদে বলা হয়েছেঃ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً "এ হলো আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য রইলো নিদর্শন হিসেবে।" আর সূরা বনী ইসরাঈলে এর চাইতেও বেশী বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছেঃ

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا –

"পূর্ববর্তী লোকদের নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত রাখে। সামূদদের সামনে আমি চোখে দেখা উটনী নিয়ে আসি। তবুও তারা তার ওপর জুলুম করে। নিদর্শন তো আমি পাঠাই ভয় দেখাবার জন্য (তামাসা দেখাবার জন্য পাঠাই না)।" (৫৯ আয়াত)

উটনীকে মাঠে ময়দানে ছেড়ে দেবার পর এ কাফের জাতিকে যে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয় তা ছিল এর অতিরিক্ত। কেবলমাত্র একটি মু'জিযা পেশ করেই এ ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ দেয়া যেতে পারে।

১০৪. অর্থাৎ পালাক্রমে একদিন এ উটনীটি একাই তোমাদের কূয়া ও প্রস্রবনগুলো থেকে পানি পান করবে এবং একদিন জাতির সমস্ত লোকজন ও জন্তু-জানোয়ার পানি পান করবে। সাবধান, তার পানি পান করার দিন যেন কোন ব্যক্তি পানি নেবার জায়গায় না যায়। এটি ছিল একটি অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আরবের বিশেষ অবস্থায় কোন ব্যক্তির জন্য এর চেয়ে বড় আর কোন চ্যালেঞ্জ হতে পারতো না। সেখানে তো পানিই ছিল জীবনের মূখ্য বিষয় এবং এ বিষয়টি নিয়ে ঝগড়া ঝাঁটি করে খুনাখুনি হয়ে যেতো। গোত্রগুলো পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হতো। তারপর প্রাণের বিনিময়ে কেউ কোন ঝরণা বা কূয়া থেকে পানি নেবার অধিকার লাভ করতো। সেখানে জাতির এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে দিলেন, একদিন শুধুমাত্র আমার উটনী একাই সমস্ত কূয়া ও ঝরণা থেকে পানি পান করবে এবং জাতির সমস্ত লোক ও জন্তু-জানোয়াররা কেবলমাত্র দ্বিতীয় দিনেই পানি নিতে পারবে। তাঁর একথা বলার ছিল এই যে, তিনি যেন সমগ্র জাতিকে যুদ্ধ করার জন্য চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন। একটি বিরাট ও পরাক্রমশালী সেনাবাহিনী ছাড়া আরবে কোন ব্যক্তি এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারতো না। অন্যদিকে কোন জাতি যতক্ষণ না স্বচক্ষে দেখতে পেতো, চ্যালেঞ্জদানকারীর পেছনে এত বিপুল সংখ্যক তরবারিধারী ও এতবড় তীরন্দাজ বাহিনী রয়েছে যারা প্রতিপক্ষের যে কোন পদক্ষেপকে পিষে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। ততক্ষণ তারা একথা শুনতে প্রস্তুত হতো না। কিন্তু হযরত সালেহ (আ) কোন সেনাবাহিনীর শক্তি ছাড়াই একাকী দাঁড়িয়ে নিজের জাতিকে এ চ্যালেঞ্জ দিলেন এবং জাতি কেবল কান পেতে তা শুনলই না বরং বহুদিন পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে তা পালনও করতে থাকলো।

সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদে এর ওপর আরো এতটুকু বাড়ানো হয়েছেঃ

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ -

"এ হচ্ছে আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। একে আল্লাহর যমীনে চরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দাও। কখনো খারাপ মতলবে এর গায়ে হাত দিয়ো না।"

অর্থাৎ চ্যালেঞ্জ কেবল এতটুকুই ছিল না যে, কেবল একদিন পর পর উটনীটি একাই হবে সারাদিন সমস্ত এলাকার পানির ইজারাদার বরং এর ওপর বাড়তি চ্যালেঞ্জ ছিল এই যে, সে সারাদিন তোমাদের ক্ষেতে–খামারে, ফলের বাগানে, খেজুর উদ্যানে ও চারণক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াবে, যেখানে চাইবে যাবে, যা ইচ্ছা খাবে, খবরদার! তোমরা কেউ তার গায়ে হাত দিতে পারবে না।

১০৫. এর অর্থ এ নয় যে, হযরত সালেহের এ চ্যালেঞ্জ শোনার সাথে সাথেই তারা উটনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার পায়ের রগ কেটে দেয়। বরং দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ উটনীটি সমগ্র জাতির জন্য একটি সমস্যা হয়ে থাকে। লোকেরা মনে মনে এর বিরুদ্ধে ফুঁসতে থাকে। পরামর্শ করতে থাকে। শেষমেষ জাতিকে এ আপদমুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন সরদার। সূরা আশ্ শাম্সে এ ব্যক্তির উল্লেখ এভাবে করা হয়েছেঃ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقَاهَا "যখন এ জাতির সবচেয়ে বড় পাপিষ্ঠ লোকটি উদ্যোগী হলো" এবং সূরা আল কামারে বলা হয়েছেঃ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ "তারা নিজেদের সাথীকে আহবান জানালো, শেষ পর্যন্ত সে একাজটি নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিল এবং সে গিঁঠের রগ কেটে দিল।"

১০৬. কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তা হচ্ছে এই যে, উটনীকে মেরে ফেলার পর হযরত সালেহ ঘোষণা করেনঃ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ "তিনদিন নিজেদের গৃহে আয়েশ আরাম করে নাও।" (হূদ ৬৫ আয়াত) এ বিজ্ঞপ্তির মিয়াদ শেষ হবার পর রাতের শেষ প্রহরে ভোরের কাছাকাছি সময়ে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। এ সংগে সংঘটিত হয় ভয়াবহ ভূমিকম্প। ফলে মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। সকাল হবার পর চারদিকে লাশের পর লাশ এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল যেন মনে হচ্ছিল, শুকনো লতাগুল্ম জন্তু–জানোয়ারের পদদলনে বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তাদের সুরম্য প্রাসাদ এবং পার্বত্য গুহাগুলো তাদেরকে এ ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ (القمر : ٣١)

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (اعراف : ٧٨)

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ - فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (الحجر : ٨٣ - ٨٤)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ِالْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

৯ রুকূ'

লূতের জাতি রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।[১০৭] স্মরণ করো যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো আমার রব্বুল আলামীনের। তোমরা কি গোটা দুনিয়ার মধ্যে পুরুষদের কাছে যাও[১০৮] এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে তোমাদের রব তোমাদের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা পরিহার করে থাকো?[১০৯] বরং তোমরা তো সীমা-ই অতিক্রম করে গেছো।"[১১০]

১০৭. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ ৮০-৮৪, হূদ ৭৪-৮৩, আল হিজ্‌র ৫৭-৭৭, আল আম্বিয়া ৭১-৭৫, আন্ নামল ৫৪-৫৮, আল আনকাবুত ২৮-৩৫, আস্ সাফ্‌ফাত ১৩৩-১৩৮ এবং আল কামার ৩৩-৩৯ আয়াত।

১০৮. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে তোমরা শুধুমাত্র পুরুষদেরকে বাছাই করে নিয়েছো নিজেদের যৌন ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য, অথচ দুনিয়ায় বিপুল সংখ্যক মেয়ে রয়েছে। দুই, সারা দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র তোমরাই যৌন ক্ষুধা মেটাবার জন্য পুরুষদের কাছে যাও। নয়তো মানব জাতির মধ্যে এমন দল দ্বিতীয়টি নেই। বরং পশুদের মধ্যেও কেউ এ কাজ করে না। সূরা আ'রাফ ও সূরা আনকাবুতে এ দ্বিতীয় অর্থটিকে আরো সুস্পষ্ট করে এভাবে তুলে ধরা হয়েছেঃ

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ -

"তোমরা কি এমন নির্লজ্জতার কাজ কর, যা দুনিয়ার সৃষ্টিকুলের মধ্যে তোমাদের আগে কেউ করেনি?"

১০৯. এরও দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এ ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য আল্লাহ যে স্ত্রী জাতির সৃষ্টি করেছিলেন তাদেরকে বাদ দিয়ে তোমরা অস্বাভাবিক উপায়ে অর্থাৎ পুরুষদেরকে এ

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾

তারা বললো, "হে লূত! যদি তুমি এসব কথা থেকে বিরত না হও, তাহলে আমাদের জনপদগুলো থেকে যেসব লোককে বের করে দেয়া হয়েছে তুমিও নির্ঘাত তাদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।"[১১১] সে বললো, "তোমাদের এসব কৃতকর্মের জন্য যারা দুঃখবোধ করে আমি তাদের অন্তরভুক্ত। হে আমার রব! আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনকে এদের কুকর্ম থেকে মুক্তি দাও।"[১১২] শেষে আমি তাকে ও তার সমস্ত পরিবার পরিজনকে রক্ষা করলাম, এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে পেছনে অবস্থানকারীদের দলভুক্ত ছিল।[১১৩] তারপর অবশিষ্ট লোকদেরকে আমি ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের ওপর বর্ষণ করলাম একটি বৃষ্টিধারা, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের ওপর বর্ষিত এ বৃষ্টি ছিল বড়ই নিকৃষ্ট।[১১৪]

নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই মান্যকারী নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালী এবং করুণাময়ও।

উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছো। দুই, আল্লাহ এ স্ত্রীদের মধ্যে এ ক্ষুধা পরিতৃপ্তির যে স্বাভাবিক পথ রেখেছিলেন তা বাদ দিয়ে তোমরা অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করছো। এই দ্বিতীয় অর্থটি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, এ জালেমরা নিজেদের স্ত্রীদেরকেও প্রকৃতি বিরোধী পথে ব্যবহার করতো। হতে পারে পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এ কাজ করেছে।

১১০. অর্থাৎ তোমাদের কেবলমাত্র এ একটিই অপরাধ নয়। তোমাদের জীবনের সমস্ত রীতিই সীমাতিরিক্ত ভাবে বিগড়ে গেছে। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে তাদের এ সাধারণ অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ –

"তোমাদের অবস্থা কি এমন হয়ে গেছে যে, চোখে দেখে অশ্লীল কাজ করছো?
(আন্ নামল ঃ ৫৪)

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ

"তোমরা কি এমনই বিকৃত হয়ে গেছো যে, পুরুষদের সাথে সংগম করছো, রাজপথে দস্যুতা করছো এবং নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে খারাপ কাজ করছো?"

(আল আনকাবুত ঃ ২৯ আয়াত)

[আরো বেশী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল হিজর ৩৯ টীকা]।

১১১. অর্থাৎ তুমি জানো এর আগে যে ব্যক্তিই আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে অথবা আমাদের কাজের প্রতিবাদ করেছে কিংবা আমাদের ইচ্ছা বিরোধী কাজ করেছে তাকেই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। এখন যদি তুমি এসব কথা বলতে থাকো, তাহলে তোমার পরিণামও অনুরূপই হবে। সূরা আ'রাফ ও সূরা নাম্‌লে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত লূতকে (আ) এ নোটিশ দেবার আগে এ পাপাচারী জাতির লোকেরা নিজেদের মধ্যে ফায়সালা করে নিয়েছিল ঃ

اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۔

"লূত ও তার পরিবারের লোকদের এবং সাথীদেরকে নিজেদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা বড়ই পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। এ 'নেককারদের'কে বাইরের পথ দেখিয়ে দাও।"

১১২. এর এ অর্থও হতে পারে, তাদের খারাপ কাজের খারাপ পরিণাম থেকে আমাদের বাঁচাও। আবার এ অর্থও হতে পারে, এই অসৎ লোকদের জনপদে যেসব নৈতিক আবর্জনা ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের সন্তান সন্ততিদের গায়ে যেন সেগুলোর স্পর্শ লেগে না যায়। ঈমানদারদের নিজেদের বংশধররা যেন নোংরা পরিবেশে প্রভাবিত না হয়ে পড়ে। কাজেই হে আমাদের রব! এ কলুষিত সমাজে জীবন যাপন করার ফলে আমরা যে সার্বক্ষণিক আযাবে লিপ্ত হচ্ছি তার হাত থেকে আমাদের বাঁচাও।

১১৩. এখানে হযরত লূতের (আ) স্ত্রীর কথা বলা হচ্ছে। সূরা তাহরীমে হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূতের (আ) স্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا –

"এ মহিলা দু'টি আমার দু'জন সৎ বান্দার গৃহে ছিল। কিন্তু তারা তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।" (১০ আয়াত)

অর্থাৎ তারা উভয়ই ছিল ঈমান শূন্য এবং নিজেদের সৎ স্বামীদের সাথে সহযোগিতা করার পরিবর্তে তারা তাদের কাফের জাতির সহযোগী হয়। এজন্য আল্লাহ যখন লূতের জাতির ওপর আযাব নাযিল করার ফায়সালা করলেন এবং হযরত লূতকে নিজের পরিবার পরিজনদের নিয়ে এ এলাকা ত্যাগ করার হুকুম দিলেন তখন সাথে সাথে নিজের স্ত্রীকে সংগে না নেবার হুকুমও দিলেনঃ

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ –

"কাজেই কিছু রাত থাকতেই তুমি নিজের পরিবার–পরিজনদেরকে সাথে নিয়ে বের হয়ে যাও এবং তোমাদের কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে সংগে করে নিয়ে যাবে না। তাদের ভাগ্যে যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে।"

(হূদ ঃ ৮১ আয়াত)

১১৪. এ বৃষ্টি বলতে এখানে পানির বৃষ্টি নয় বরং পাথর বৃষ্টির কথা বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ আযাবের যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত লূত যখন রাতের শেষ প্রহরে নিজের সন্তান–পরিজনদের নিয়ে বের হয়ে গেলেন তখন ভোরের আলো ফুটতেই সহসা একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ) একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প তাদের জনপদকে ওলট পালট করে দিয়ে গেলো। (جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا) একটি ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির অগ্নোৎপাতের মাধ্যমে তাদের ওপর পোড়ামাটির পাথর বর্ষণ করা হলোঃ (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ) এবং একটি ঝড়ো হাওয়ার মাধ্যমেও তাদের ওপর পাথর বর্ষণ করা হয়েছে ঃ (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا)

বাইবেলের বর্ণনাসমূহ, প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন রচনাবলী, আধুনিক ভূমিস্তর গবেষণা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ থেকে এ আযাবের বিস্তারিত বিবরণের ওপর যে আলোকপাত হয় তার সংক্ষিপ্ত সার নিচে বর্ণনা করছি ঃ

মরু সাগরের (Dead sea) দক্ষিণ ও পশ্চিমে যে এলাকাটি বর্তমানে একেবারেই বিরান ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে বিপুল সংখ্যক পুরাতন জনপদের ঘর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো প্রমাণ করে যে, এটি এক সময় ছিল অত্যন্ত জনবহুল এলাকা। আজ সেখানে শত শত ধ্বংস প্রাপ্ত পল্লীর চিহ্ন পাওয়া যায়। অথচ বর্তমানে এ এলাকাটি আর তেমন শস্যশ্যামল নয়। ফলে এ পরিমাণ জনবসতি লালন করার ক্ষমতা তার নেই। প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণের ধারণা, খৃষ্টপূর্ব ২৩০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১৯০০ সাল পর্যন্ত এটি ছিল বিপুল জনবসতি ও প্রাচুর্যপূর্ণ এলাকা। আর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আমল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের অনুমান, সেটি ছিল খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার সালের কাছাকাছি সময়। এদিক দিয়ে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সাক্ষ একথা সমর্থন করে যে, এ এলাকাটি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর ভাতিজা হযরত লূতের সময় ধ্বংস হয়েছিল।

বাইবেলে যে এলাকাটিকে বলা হয়েছে 'সিদ্দিমের উপত্যকা' সেটিই ছিল এখানকার সবচেয়ে জনবহুল ও শস্য–শ্যামল এলাকা। এ এলাকাটি সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছেঃ যর্দ্দনের সমস্ত অঞ্চল সোয়র পর্যন্ত সর্বত্র সজল, সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায়, মিসর দেশের ন্যায়, কেননা তৎকালে সদাপ্রভু সদোম ও ঘমোরা বিনষ্ট করেন নাই।" (আদিপুস্তক ১৩:১০) বর্তমান কালের গবেষকদের অধিকাংশের মত হচ্ছে, সে উপত্যকাটি বর্তমানে মরুসাগরের বুকে জলমগ্ন আছে। বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষের সাক্ষ–প্রমাণ থেকে এ মত গঠন
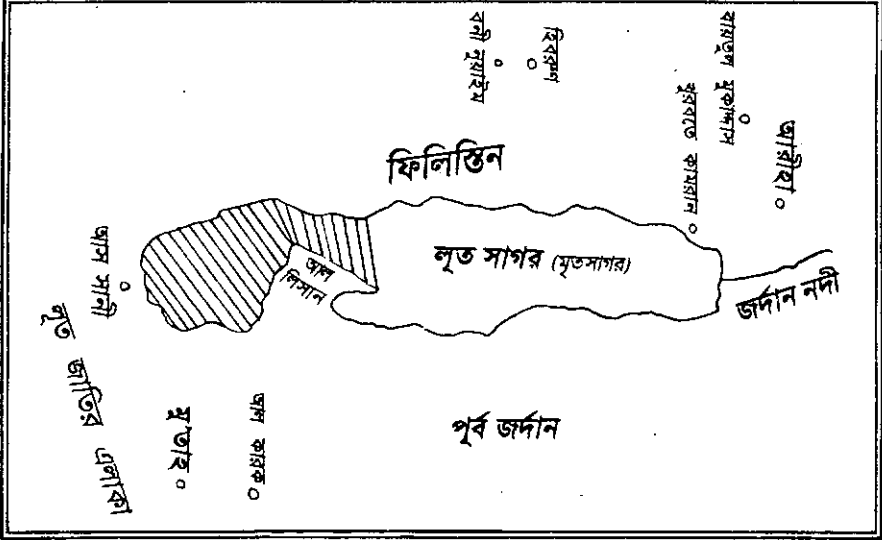
করা হয়েছে। প্রাচীনকালে মরুসাগর দক্ষিণ দিকে আজকের মতো এতটা বিস্তৃত ছিল না। ট্রান্স জর্দানের বর্তমান শহর 'আল করক'–এর সামনে পশ্চিম দিকে এ হ্রদের মধ্যে 'আল লিসান' নামক একটি ব–দ্বীপ দেখা যায়। প্রাচীনকালে এখানেই ছিল পানির শেষ প্রান্ত। এর নিম্নাঞ্চলে বর্তমানে পানি ছড়িয়ে গেছে (সংশ্লিষ্ট নকশায় পার্শ্বরেখা দিয়ে একে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি)। পূর্বে এটি উর্বর শস্যশ্যামল এলাকা হিসেবে জনবসতিপূর্ণ ছিল। এটিই ছিল সিদ্দিম উপত্যকা এবং এখানেই ছিল লূতের জাতির সদোম, ঘমোরা, অদমা, সবোয়ীম ও সুগার–এর মতো বড় বড় শহরগুলো। খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বছরের কাছাকাছি এক সময় একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পে এ উপত্যকাটি ফেটে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে যায় এবং মরুসাগরের পানি একে নির্মজ্জিত করে ফেলে। আজো এটি হ্রদের সবচেয়ে অগভীর অংশ। কিন্তু বাইজানটাইন শাসকদের যুগে এ অংশটি এত বেশী অগভীর ছিল যে, লোকেরা আল লিসান থেকে পশ্চিম তীর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে পানি পার হয়ে যেতো। তখনো দক্ষিণ তীরের লাগোয়া এলাকায় পানির মধ্যে ডুবন্ত বনাঞ্চল পরিষ্কার দেখা যেতো। বরং পানির মধ্যে কিছু দালান কোঠা ডুবে আছে বলে সন্দেহ করা হতো।

বাইবেল ও পুরাতন গ্রীক ও ল্যাটিন রচনাবলী থেকে জানা যায়, এ এলাকায় বিভিন্ন স্থানে নাফাত (পেট্রোল) ও স্ফল্টের কূয়া ছিল। অনেক জায়গায় ভূগর্ভ থেকে অগ্নিউদ্দীপক গ্যাসও বের হতো। এখনো সেখানে ভূগর্ভে পেট্রোল ও গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ভূ–স্তর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমান করা হয়েছে, ভূমিকম্পের প্রচণ্ড ঝাকুনীর সাথে পেট্রোল, গ্যাস ও স্ফল্ট ভূ–গর্ভ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠে এবং সমগ্র এলাকা ভস্মীভূত হয়ে যায়। বাইবেলের বর্ণনা মতে, এ ধ্বংসের খবর পেয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হিব্রোন থেকে এ উপত্যকার অবস্থা দেখতে আসেন। তখন মাটির মধ্য থেকে কামারের ভাটির ধোঁয়ার মতো ধোঁয়া উঠছিল। (আদিপুস্তক ১৯ ঃ ২৮)।

كَذَّبَ أَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٨٤﴾

১০ রুকূ'

আইকাবাসীরা রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।[১১৫] যখন শো'আইব তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি এ কাজে তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের। তোমরা মাপ পূর্ণ করে দাও এবং কাউকে কম দিয়ো না। সঠিক পাল্লায় ওজন করো এবং লোকদেরকে তাদের জিনিস কম দিয়ো না। যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িও না এবং সেই সত্তাকে ভয় করো যিনি তোমাদের ও অতীতের প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছেন।"

১১৫. আইকাবাসীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে সূরা আল হিজ্‌রের ৭৮–৮৪ আয়াতে করা হয়েছে। এখানে করা হচ্ছে তার বিস্তারিত আলোচনা। মাদ্‌য়ান ও আইকাবাসীরা দু'টি আলাদা জাতি অথবা একটি জাতির দু'টি পৃথক নাম, এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। একদল মনে করেন, তারা দু'টি পৃথক জাতি। এজন্য তাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে, সূরা আ'রাফে হযরত শো'আইবকে মাদ্‌য়ানবাসীদের ভাই বলা হয়েছেঃ (وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا) আর এখানে আইকাবাসীদের উল্লেখ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বলা হয়েছে إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ (যখন শু'আইব তাদেরকে বললো)। এখানে তাদের ভাই (أَخُوْهُمْ) শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। পক্ষান্তরে কোন কোন মুফাস্‌সির উভয়কে একই জাতি গণ্য করেছেন। কারণ সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদে মাদ্‌য়ানবাসীদের যেসব রোগ ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে এখানে আইকাবাসীদের সে একই রোগ ও গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। হযরত শো'আইবের দাওয়াত ও উপদেশও একই এবং শেষে তাদের পরিণতির মধ্যেও কোন ফারাক নেই।
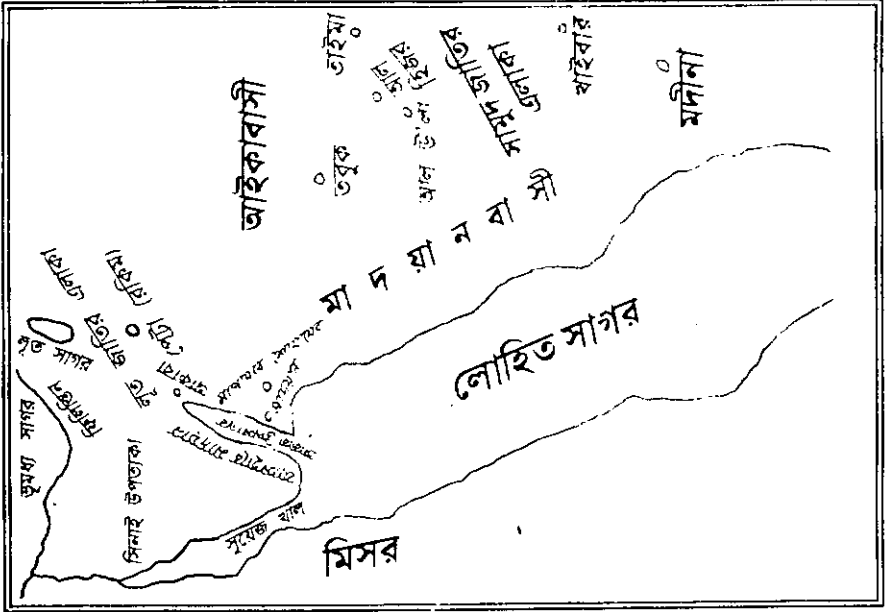
গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায়, এ দু'টি উক্তি মূলতঃ সঠিক। সন্দেহাতীতভাবে মাদ্য়ানবাসী ও আইকাবাসীরা দু'টি আলাদা গোত্র। কিন্তু মূলত তারা একই বংশধারার দু'টি পৃথক শাখা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী বা দাসী কাতূরার গর্ভজাত সন্তানরা আরব ও ইসরাঈলী ইতিহাসে বনী কাতূরা নামে পরিচিত। এদের একটি গোত্র সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করে। মাদ্য়ান ইবনে ইবরাহীমের বংশোদ্ভূত হবার ফলে তাদেরকে মাদ্য়ানী বা মাদ্য়ান বাসী বলা হয়। এদের বসতি উত্তর হেজায থেকে ফিলিস্তীনের দক্ষিণ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সিনাই বদ্বীপের শেষ কিনারা পর্যন্ত লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূল এলাকায় বিস্তৃত হয়। এর কেন্দ্রস্থল ছিল মাদ্য়ান শহর। আবুল ফিদার মতে এটি আকাবা উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে আইলা (বর্তমান আকাবা) থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। বনী কাতূরার অন্যান্য গোত্রের মধ্যে বনী দীদান (Dedantics) তুলনামূলকভাবে বেশী পরিচিত। উত্তর আরবে তাইমা, তাবুক ও আল'উলার মাঝামাঝি স্থানে তারা বসতি গড়ে। তাদের কেন্দ্রীয় স্থান ছিল তাবুক। প্রাচীনকালে একে আইকা বলা হতো। (মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে ইয়াকূত আইকা শব্দের আলোচনায় বলেছেন, এটি তাবুকের পুরাতন নাম এবং তাবুকবাসীদের মধ্যে একথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, এ স্থানটিই এক সময় আইকা নামে পরিচিত ছিল।)

মাদ্য়ানবাসী ও আইকাবাসীদের জন্য একজন রসূল পাঠাবার কারণ সম্ভবত এছিল যে, তারা একই বংশধারার সাথে সম্পর্কিত ছিল, একই ভাষায় কথা বলতো এবং তাদের এলাকাও পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ছিল। বরং বিচিত্র নয়, কোন কোন এলাকায় তাদের বসতি একই সংগে গড়ে উঠেছিল এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়ে সমাজে তারা মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বনী কাতূরার এ দু'শাখার লোকদের পেশাও ছিল ব্যবসায়। তাদের মধ্যে একই ধরনের ব্যবসায়িক অসততা

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٥﴾ وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٦﴾ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٨٩﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٠﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٩١﴾

তারা বললো, "তুমি নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি এবং তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। আর আমরা তো তোমাকে একেবারেই মিথ্যুক মনে করি। যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি টুকরা ভেংগে আমাদের ওপর ফেলে দাও।" শো'আইব বললো, আমার রব জানেন তোমরা যা কিছু করছো।"[১১৬] তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। শেষ পর্যন্ত ছাতার দিনের আযাব তাদের ওপর এসে পড়লো[১১৭] এবং তা ছিল বড়ই ভয়াবহ দিনের আযাব।

নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশ মান্যকারী নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালী এবং দয়াময়ও।

এবং ধর্মীয় ও চারিত্রিক দোষ পাওয়া যেতো। বাইবেলের প্রথম দিকের পুস্তকগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় এ আলোচনা পাওয়া যায় যে, এরা বা'লে ফুগূরের পূজা করতো। বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে বের হয়ে এদের এলাকায় আসে তখন তাদের মধ্যেও এরা শির্ক ও ব্যভিচারের রোগ ছড়িয়ে দেয়। (গণনা পুস্তক ২৫ঃ ১-৫ এবং ৩১ঃ ১৬-১৭) তাছাড়া দু'টি বড় বড় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের ওপর এদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এপথ দু'টি ইয়ামন থেকে সিরিয়া এবং পারস্য উপসাগর থেকে মিসরের দিকে চলে গিয়েছিল। এ দু'টি রাজপথের ধারে বসতি হবার কারণে এদের লূটতরাজ ও রাহাজানির কারবার ছিল খুবই রমরমা। অন্যসব জাতির বাণিজ্য কাফেলাকে বিপুল পরিমাণ কর না দিয়ে তারা এ এলাকা অতিক্রম করতে দিতো না। নিজেরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ দখল করে রাখার ফলে পথের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে রেখেছিল। কুরআন মজীদে তাদের এ অবস্থানকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ اِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ এ জাতি দু'টি (লূতের জাতি ও আইকাবাসী) প্রকাশ্য রাজপথের ওপর বসবাস করতো।" এদের রাহাজানির কথা সূরা আ'রাফে এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ "আর প্রত্যেক পথের ওপর লোকদেরকে ভয় দেখাবার জন্য বসে যেয়ো না।" এ সমস্ত কারণে আল্লাহ এ উভয় সম্প্রদায়ের জন্য একই নবী পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে একই ধরনের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হযরত শো'আইব ও মাদ্‌য়ানবাসীদের কাহিনী বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন আল আ'রাফের ৮৫–৯৩, হূদের ৮৪–৯৫ এবং আল আনকাবুতের ৩৬–৩৭ আয়াত।

১১৬. অর্থাৎ আযাব নাযিল করা আমার কাজ নয়। এটা তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতার অন্তরভুক্ত এবং তিনি তোমাদের কার্যকলাপ দেখছেন। যদি তিনি তোমাদেরকে এ আযাবের উপযুক্ত মনে করেন তাহলে তিনি নিজেই আযাব পাঠাবেন। আইকাবাসীদের এ দাবী ও হযরত শো'আইবের এ জবাবের মধ্যে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের জন্য একটি সতর্কবাণী ছিল। অর্থাৎ তারাও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ একই দাবী করছিলঃ

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا

"অথবা ফেলে দাও আমাদের ওপর আকাশের একটি টুক্‌রা যেমন তুমি দাবী করছো" (বনী ইসরাঈলঃ ৯২)

তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে, এ ধরনের দাবী আইকাবাসীরাও তাদের নবীর কাছে করেছিল, তার যে জবাব তারা পেয়েছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে তোমাদের দাবীর জন্যও রয়েছে সেই একই জবাব।

১১৭. এ আযাবের কোন বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে বা কোন সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়নি। শব্দের বাহ্যিক অর্থ থেকে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, তারা যেহেতু আসমানী আযাব চেয়েছিল তাই আল্লাহ তাদের ওপর পাঠিয়ে দিলেন একটি মেঘমালা। এ মেঘমালাটি আযাবের বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে না দেয়া পর্যন্ত ছাতার মতো তাদের ওপর ছেয়ে রইলো। কুরআন থেকে একথা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, মাদ্‌য়ানবাসীদের আযাবের ধরন আইকাবাসীদের আযাব থেকে আলাদা ছিল। যেমন এখানে বলা হয়েছে এরা ছাতার দিনের আযাবে ধ্বংস হয়েছিল। আর তাদের ওপর আযাব এসেছিল একটি বিস্ফোরণ ও ভূমিকম্পের মাধ্যমে। (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ এবং

وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ)

তাই এদের উভয় সম্প্রদায়কে মিলিয়ে একটি কাহিনী বানিয়ে দেবার চেষ্টা করা ঠিক নয়। কোন কোন তাফসীরকার "ছাতার দিনের আযাব"–এর কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাদের এসব তথ্যের উৎস আমাদের জানা নেই। ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ

مَنْ حَدَّثَكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَا عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ فَكَذِّبْهُ –

"আলেমদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই ছাতার দিনের আযাব কি ছিল সে সম্পর্কে তোমাকে কোন তথ্য জানাবে, তা সঠিক বলে মেনে নিয়ো না।"

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ ﴿١٩٣﴾ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِيْ زُبُرِ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً أَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ﴿١٩٧﴾

১১ রুকূ'

এটি[১১৮] রব্বুল আলামীনের নাযিল করা জিনিস।[১১৯] একে নিয়ে আমানতদার রূহ[১২০] অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি তাদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাও যারা (আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর সৃষ্টির জন্য) সতর্ককারী হয়, পরিষ্কার আরবী ভাষায়।[১২১] আর আগের লোকদের কিতাবেও একথা আছে।[১২২] এটা কি এদের (মক্কাবাসীদের) জন্য কোন নিদর্শন নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেম সমাজ একে জানে?[১২৩]

১১৮. ঐতিহাসিক বর্ণনা শেষ করে এবার আলোচনার ধারা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এমন এক বিষয়ের দিকে যার মাধ্যমে সূরার সূচনা করা হয়েছিল। এ বিষয়টি বুঝতে হলে আর একবার পেছন ফিরে প্রথম রুকু'টি দেখে নেয়া উচিত।

১১৯ . অর্থাৎ এ "সুস্পষ্ট কিতাব" টি যার আয়াত এখানে শোনানো হচ্ছে এবং এ "কথা" যা থেকে লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এটা কোন মানুষের মনগড়া জিনিস নয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রচনা করেননি। বরং রব্বুল আলামীন নাযিল করেছেন।

১২০. অর্থাৎ জিব্রীল আলাইহিস সালাম, যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ –

"বলে দাও, যে ব্যক্তি জিব্রীলের সাথে শত্রুতা রাখে তার জানা উচিত, সে–ই এ কুরআন আল্লাহর হুকুমে তোমার অন্তরে নাযিল করেছে।" (আল বাকারাহ ঃ ৯৭)

এখানে তাঁর নাম না নিয়ে তাঁর জন্য "রূহুল আমীন" (আমানতদার বা বিশ্বস্ত রূহ) পদবী ব্যবহার করে একথা ব্যক্ত করতে চাওয়া হয়েছে যে, রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এ নাযিলকৃত জিনিসটি নিয়ে কোন বস্তুগত শক্তি আসেনি, যার মধ্যে পরিবর্তন ও অবক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে বরং এসেছে একটি নির্ভেজাল রূহ। তার মধ্যে বস্তুবাদিতার কোন গন্ধ নেই। তিনি পুরোপুরি আমাতনদার। আল্লাহর বাণী যেভাবে তাঁকে সোপর্দ করে দেয়া হয় ঠিক তেমনি হুবহু তিনি তা পৌছিয়ে দেন। নিজের পক্ষ থেকে কিছু বাড়ানো বা কমানো অথবা নিজেই কিছু রচনা করে নেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

১২১. এ বাক্যটির সম্পর্ক "আমানতদার রূহ অবতরণ করেছে" এর সাথেও হতে পারে আবার "যারা সতর্ককারী হয়" এর সাথেও হতে পারে। প্রথম অবস্থায় এর অর্থ হবে, সেই আমানতদার রূহ তাকে এনেছেন পরিষ্কার আরবী ভাষায় এবং দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনসব নবীদের অন্তরভুক্ত যাদেরকে আরবী ভাষার মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। এ নবীগণ ছিলেন হূদ, সালেহ, ইসমাঈল ও শো'আইব আলাইহিমুস সালাম। উভয় অবস্থায় বক্তব্যের উদ্দেশ্য একই এবং তা হচ্ছে রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এ শিক্ষা কোন মৃত ভাষায় বা জিনদের ভাষায় আসেনি এবং এর মধ্যে ধাঁধা বা হেঁয়ালি মার্কা কোন গোলমেলে ভাষা ব্যবহার করা হয়নি। বরং এটা এমন প্রাঞ্জল, পরিষ্কার ও উন্নত বাগধারা সম্পন্ন আরবী ভাষায় রচিত, যার অর্থ ও বক্তব্য প্রত্যেক আরবী ভাষাভাষী ও আরবী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অতি সহজে ও স্বাভাবিকভাবে অনুধাবন করতে পারে। তাই যারা এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তারা এর শিক্ষা বুঝতে পারেনি তাদের দিক থেকে এ ধরনের ওজর পেশ করার কোন সুযোগ নেই। বরং তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও অস্বীকার করার কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র এই যে, তারা মিসরের ফেরাউন, ইবরাহীমের জাতি, নূহের জাতি, লূতের জাতি, আদ ও সামূদ জাতি এবং আইকাবাসীদের মতো একই রোগে ভূগছিল।

১২২. অর্থাৎ একথা, এ অবতীর্ণ বিষয় এবং এ আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা ইতিপূর্বেকার আসমানী কিতাবগুলোতে রয়েছে। এক আল্লাহর বন্দেগীর একই আহবান, পরকালের জীবনের এই একই বিশ্বাস, নবীদের পথ অনুসরণের একই পদ্ধতি সেসব কিতাবেও পেশ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব কিতাব এসেছে সেগুলো শিরকের নিন্দাই করে। সেগুলো বস্তুবাদী জীবনাদর্শ ত্যাগ করে এমন সত্য জীবনাদর্শ গ্রহণের আহবান জানায় যেগুলোর ভিত্তি আল্লাহর সামনে মানুষের জবাবদিহির ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে সকল কিতাবের অভিন্ন দাবী এই যে, মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ও ক্ষমতা পরিত্যাগ করে নবীদের আনীত আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চলুক। এসব কথার মধ্যে কোনটাই নতুন নয়। দুনিয়ায় কুরআনই প্রথমবার একথাগুলো পেশ করছেনা। কোন ব্যক্তি বলতে পারবে না, তোমরা এমনসব কথা বলছো যা পূর্বের ও পরের কেউ কখনো বলেনি।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি পুরাতন অভিমতের সপক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে এ আয়াতটি তার অন্যতম। ইমাম সাহেবের মতটি হচ্ছে ঃ

যদি কোন ব্যক্তি নামাযে কুরআনের অনুবাদ পড়ে নেয় সে আরবীতে কুরআন পড়তে সক্ষম হলেও বা না হলেও, তার নামায হয়ে যায়। আল্লামা আবু বকর জাসসাসের ভাষায় এ যুক্তির ভিত্তি হলো, আল্লাহ এখানে বলছেন, এ কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যেও ছিল। আর একথা সুস্পষ্ঠ, সে কিতাবগুলোতে কুরআন আরবী ভাষার শব্দ সমন্বয়ে ছিল না। অন্য ভাষায় কুরআনের বিষয়বস্তু উদ্ধৃত করে দেয়া সত্ত্বেও তা কুরআনই থাকে। কুরআন হওয়াকে বাতিল করে দেয় না। (আহকামুল কুরআন, তৃতীয় খণ্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা) কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা একেবারেই সুস্পষ্ট। কুরআন মজীদ বা অন্য কোন আসমানী কিতাবের কোনটিরও নাযিল হবার ধরন এমন ছিল না যে, আল্লাহ নবীর

অন্তরে কেবল অর্থই সঞ্চার করে দিয়েছেন এবং তারপর নবী তাকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বরং প্রত্যেকটি কিতাব যে ভাষায় এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে শব্দ ও বিষয়বস্তু উভয়টি সহকারেই এসেছে। পূর্ববর্তী যেসব কিতাবে কুরআনের শিক্ষা ছিল মানবিক ভাষা সহকারে নয় বরং আল্লাহর ভাষা সহকারেই ছিল এবং সেগুলোর কোনটির অনুবাদকেও আল্লাহর কিতাব বলা যেতে পারে না এবং তাকে আসলের স্থলাভিষিক্ত করাও সম্ভব নয়। আর কুরআন সম্পর্কে বার বার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, তার প্রতিটি শব্দ আরবী ভাষায় হুবহু নাযিল হয়েছে ঃ (يوسف : ٢) اِنَّا اَنۡزَلۡنٰهُ قُرۡءٰنًا عَرَبِيًّا "নিশ্চিতভাবেই আমি তা নাযিল করেছি কুরআন আকারে আরবী ভাষায়।" وَكَذٰلِكَ اَنۡزَلۡنٰهُ حُكۡمًا عَرَبِيًّا "আর এভাবে আমি তা নাযিল করেছি একটি নির্দেশ আরবী ভাষায়।" (আর্ রা'দ ঃ ৩৭) (الزمر : ٢٨) قُرۡءٰنًا عَرَبِيًّا غَيۡرَ ذِىۡ عِوَجٍ "আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত" (আয্ যুমার ঃ ২৮) তারপর আলোচ্য আয়াতের সাথে সংযুক্ত পূর্ববর্তী আয়াতেই বলা হয়েছে, রুহুল আমীন আরবী ভাষায় একে নিয়ে নাযিল হয়েছেন। এখন তার সম্পর্কে কেমন করে একথা বলা যেতে পারে যে, কোন মানুষ অন্য ভাষায় তার যে অনুবাদ করেছে তাও কুরআনই হবে এবং তার শব্দাবলী আল্লাহর শব্দাবলীর স্থলাভিষিক্ত হবে? মনে হচ্ছে যুক্তির এ দুর্বলতাটি মহান ইমাম পরবর্তী সময়ে উপলব্ধি করে থাকতে পারেন। তাই নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ বিষয়ে নিজের অভিমত পরিবর্তন করে তিনি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি আরবী ভাষায় কিরাআত তথা কুরআন পড়তে সক্ষম নয় সে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযে কুরআনের অনুবাদ পড়তে পারে যতক্ষণ সে আরবী শব্দ উচ্চারণ করার যোগ্যতা অর্জন না করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আরবীতে কুরআন পড়তে পারে সে যদি কুরআনের অনুবাদ পড়ে তাহলে তার নামায হবে না। আসলে ইমামদ্বয় এমন সব আজমী তথা অনারব নওমুসলিমদেরকে এ সুযোগটি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই আরবী ভাষায় নামায পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারতো না। এ ব্যাপারে কুরআনের অনুবাদও কুরআন এটা তাদের যুক্তির ভিত্তি ছিল না। বরং তাদের যুক্তি ছিল, ইশারায় রুকূ সিজদা করা যেমন রুকূ–সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য জায়েয ঠিক তেমনি আরবী ছাড়া অন্যভাষায় নামায পড়াও এমন ব্যক্তির জন্য জায়েয যে আরবী হরফ উচ্চারণ করতে অক্ষম। অনুরূপভাবে যেমন অক্ষমতা দূর হবার পর ইশারায় রুকূ–সিজদাকারীর নামায হবে না ঠিক তেমনি কুরআন পড়ার ক্ষমতা অর্জন করার পর অনুবাদ পাঠকারীর নামাযও হবে না। (এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সারখ্সী লিখিত মাবসূত, প্রথম খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা এবং ফাতহুল কাদীর ও শারহে ইনায়াহ আলাল হিদায়াহ প্রথম খণ্ড, ১৯০–২০১ পৃষ্ঠা।)

১২৩. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের আলেমরা একথা জানে যে, কুরআন মজীদে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা ঠিক সেই একই শিক্ষা যা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতে দেয়া হয়েছিল। মক্কাবাসীরা কিতাবের জ্ঞান না রাখলেও আশেপাশের এলাকায় বনী ইসরাঈলের বিপুল সংখ্যক আলেম ও বিদ্বান রয়েছে। তারা জানে, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আজ প্রথমবার তাদের সামনে কোন অভিনব ও অদ্ভুত "কথা" রাখেননি বরং হাজার হাজার

বছর থেকে আল্লাহর নবীগণ এই একই কথা বারবার এনেছেন। এ নাযিলকৃত বিষয়ও সেই একই রবুল আলামীনের পক্ষ থেকে এসেছে যিনি পূর্ববর্তী কিতাবগুলো নাযিল করেছিলেন, এ কথাটি কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ততা অর্জন করার জন্য যথেষ্ট নয়?

সীরাতে ইবনে হিশাম থেকে জানা যায়, এ আয়াতগুলো নাযিল হবার কাছাকাছি সময়ে হাবৃশা (বর্তমানে ইথিয়োপিয়া) থেকে হযরত জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাওয়াত শুনে ২০ জনের একটি প্রতিনিধিদল মক্কায় আসে। তারা মসজিদে হারামে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের সামনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মোলাকাত করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন আপনি কি শিক্ষা নিয়ে এসেছেন? তিনি জবাবে কুরআনের কিছু আয়াত শুনান। এগুলো শুনে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে এবং তারা তখনই তাঁকে সত্য রসূল হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনে। তারপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে উঠে যায় তখন আবু জেহেল কয়েকজন কুরাইশীকে সাথে নিয়ে তাদের সাথে দেখা করে এবং তাদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে। সে বলে, "তোমাদের চেয়ে বেশী নির্বোধ কোন কাফেলা কখনো এখানে আসেনি। হে হতভাগার দল! তোমাদের দেশের লোকেরা তোমাদের এখানে পাঠিয়েছিল এ ব্যক্তির অবস্থা অনুসন্ধান করে তাদের কাছে সঠিক তথ্য নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু তোমরা তো তার সাক্ষাত করার সাথে সাথেই নিজেদের ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বসলে।" তারা ছিল ভদ্র ও শরীফ লোক। আবু জেহেলের এ নিন্দাবাদ ও ভর্ৎসনায় বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে তারা সালাম দিয়ে সরে গেলো এবং বলতে থাকলো : আমরা আপনার সাথে বিতর্ক করতে চাই না। আপনার ধর্ম আপনার ইচ্ছা ও ক্ষমতার আওতাধীন এবং আমাদের ধর্মও আমাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার আওতাধীন। যে জিনিসের মধ্যে নিজেদের কল্যাণ দেখেছি সেটিই আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি। (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা) সূরা কাসাসে এ ঘটনার আলোচনা এভাবে এসেছে :

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ .... وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ز سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ز لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ -

"এর আগে যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনে এবং যখন তাদেরকে তা শুনানো হয় তখন বলে, আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। এ হচ্ছে আমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য। আমরা এর আগেও এই দীন ইসলামের ওপর ছিলাম। .... আর যখন তারা অর্থহীন কথাবার্তা শুনলো তখন বিতর্ক এড়িয়ে গেলো এবং বললো আমাদের কাজ আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। তোমাদের সালাম জানাই। আমরা মূর্খদের পদ্ধতি পছন্দ করিনা। (অর্থাৎ তোমরা আমাদের দু'টি কথা শোনালে জবাবে আমরাও তোমাদের দু'টি কথা শুনালাম)

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٩﴾ كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

(কিন্তু এদের হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমি এতদূর গড়িয়েছে যে) যদি আমি এটা কোন অনারব ব্যক্তির ওপর নাযিল করে দিতাম এবং সে এই (প্রাঞ্জল আরবীয় বাণী) তাদেরকে পড়ে শোনাতো তবুও এরা মেনে নিতো না।[১২৪] অনুরূপভাবে একে (কথা) আমি অপরাধীদের হৃদয়ে বিদ্ধ করে দিয়েছি।[১২৫] তারা এর প্রতি ঈমান আনে না যতক্ষণ না কঠিন শাস্তি দেখে নেয়।[১২৬] তারপর যখন তা অসচেতন অবস্থায় তাদের ওপর এসে পড়ে তখন তারা বলে, "এখন আমরা কি অবকাশ পেতে পারি"?[১২৭]

১২৪. অর্থাৎ এখন তাদেরই জাতির এক ব্যক্তি পরিষ্কার আরবী ভাষায় এ কালাম পড়ে শুনাচ্ছেন। এতে তারা বলছে, এ ব্যক্তি নিজেই এ কালাম রচনা করেছে। আরবী ভাষীর মুখ থেকে আরবী ভাষণ উচ্চারিত হবার মধ্যে অলৌকিকতার কি আছে যে, তাকে আল্লাহর কালাম বলে মেনে নিতে হবে? কিন্তু এ উচ্চাংগের আরবী কালাম যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনারব ব্যক্তির ওপর অলৌকিক কার্যক্রম হিসেবে নাযিল করা হতো এবং সে এসে আরবদের কাছে অত্যন্ত নির্ভুল আরবীয় কায়দায় তা পড়ে শোনাতো তাহলে তারা ঈমান না আনার জন্য অন্য কোন বাহানা তালাশ করতো। তখন তারা বলতো, এর ওপর কোন জিন ভর করেছে, সে আজমীর কন্ঠে আরবী বলে যাচ্ছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা–মীম আস্ সাজ্দাহ, ৫৪–৫৮ টীকা) আসল জিনিস হচ্ছে, সত্য প্রিয় ব্যক্তির সামনে যে কথা পেশ করা হয় সে তার ওপর চিন্তা করে এবং ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে কথাটা ন্যায় সংগত কিনা সে ব্যাপারে অভিমত প্রতিষ্ঠিত করে। আর যে ব্যক্তি হঠকারী হয়, না মেনে নেয়ার ইচ্ছাই যে প্রথম থেকে লালন করে রেখেছে সে আসল বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দেয়না বরং তা প্রত্যাখান করার জন্য নানান টালবাহানা তালাশ করতে থাকে। তার সামনে কথা যেভাবেই পেশ করা হোক না কেন সে প্রত্যাখ্যান করার জন্য কোন না কোন ওজুহাত বা ছুতো তৈরি করে নেবেই। কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের এই হঠকারিতার পরদা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উন্মোচন করা হয়েছে এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, তোমরা কোন্ মুখে ঈমান আনার জন্য মুজি'যা দেখাবার শর্ত আরোপ করছো? তোমরা তো এমন লোক যাদেরকে যে কোন জিনিস দেখিয়ে দেয়া হলেও তারা তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য কোন না কোন বাহানা তালাশ করে নেবেই। কারণ তোমাদের মধ্যে সত্য কথা মেনে নেবার প্রবণতা নেই ঃ

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾

এরা কি আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে? তুমি কি কিছু ভেবে দেখেছো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ বিলাস করার অবকাশও দিই এবং তারপর আবার সেই একই জিনিস তাদের ওপর এসে পড়ে যার ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে, তাহলে জীবন যাপনের এ উপকরণগুলো যা তারা এ যাবত পেয়ে আসছে এগুলো তাদের কোন্ কাজে লাগবে?[১২৮]

(দেখো) আমি কখনো কোন জনপদকে তার জন্য উপদেশ দেয়ার যোগ্য সতর্ককারী না পাঠিয়ে ধ্বংস করিনি এবং আমি জালেম ছিলাম না।[১২৯]

এ (সুস্পষ্ট কিতাবটি) নিয়ে শয়তানরা অবতীর্ণ হয়নি।[১৩০] *এ কাজটি তাদের শোভাও পায় না।*[১৩১] *এবং তারা এমনটি করতেই পারে না।*[১৩২] *তাদেরকে তো এর শ্রবন থেকেও দূরে রাখা হয়েছে।*[১৩৩]

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ –

"যদি আমি তোমাদের ওপর কোন কাগজে লেখা কিতাব নাযিল করে দিতাম এবং এরা হাত দিয়ে তা ছুঁয়েও দেখে নিতো, তাহলেও যাদের না মানার তারা বলতো, এতো পরিষ্কার যাদু। (আল আনআম ঃ ৭)

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ –

"আর যদি আমি তাদের ওপর আকাশের কোন দরজাও খুলে দিতাম এবং তারা তার মধ্যে চড়তে থাকতো, তাহলে তারা বলতো আমাদের চোখ প্রতারিত হচ্ছে বরং আমাদের ওপর যাদু করা হয়েছে।" (আল হিজর ঃ ১৪–১৫)

১২৫. অর্থাৎ এটা সত্যপন্থীদের দিলে যেমন আত্মিক প্রশান্তি ও হৃদয়ের সান্তনা হয়ে দেখা দেয় তাদের দিলে এর প্রতিক্রিয়া ঠিক সেভাবে হয় না। বরং একটি গরম লোহার

শলাকা হয়ে এটা তাদের হৃদয়ে এমনভাবে বিদ্ধ হয় যে, তারা অস্থির হয়ে ওঠে এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে তার প্রতিবাদ করার উপায় খুঁজতে থাকে।

১২৬. ঠিক তেমনি আযাব যেমন বিভিন্ন জাতি দেখেছে বলে এ সূরায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২৭. অর্থাৎ আযাব সামনে দেখেই অপরাধীরা বিশ্বাস করতে থাকে যে, নবী যা বলেছিলেন তা ছিল যথার্থই সত্য। তখন তারা আক্ষেপ সহকারে হাত কচলাতে থাকে এবং বলতে থাকে, হায় যদি আমরা এখন কিছু অবকাশ পাই। অথচ অবকাশের সময় পার হয়ে গেছে।

১২৮. এ বাক্যটি ও এর আগের বাক্যটির মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম শূন্যতা রয়ে গেছে। শ্রোতা একটু চিন্তা ভাবনা করলে নিজেই এ শূন্যতা ভরে ফেলতে পারে। আযাব আসার কোন আশংকা তারা করতো না, তাই তারা তাড়াতাড়ি আযাব আসার জন্য হৈ চৈ করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, যেমন সুখের বাঁশি এ পর্যন্ত তারা বাজিয়ে এসেছে তেমনি চিরকাল বাজাতে থাকবে। এ ভরসায় তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চ্যালেঞ্জ দিতো এ মর্মে যে, যদি সত্যি আপনি আল্লাহর রসূল হন এবং আমরা আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহর আযাবের হকদার হয়ে থাকি, তাহলে নিন আমরা তো আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলাম, এবার নিয়ে আসুন সেই আযাব যার ভয় আমাদের দেখিয়ে আসছেন। এ কথায় বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, যদি ধরে নেয়া যায় তাদের এ ভরসা সঠিকই হয়ে থাকে, যদি তাদের ওপর তাৎক্ষণিকভাবে আযাব না আসে, যদি দুনিয়ায় আয়েশী জীবন যাপন করার জন্য তারা একটি সুদীর্ঘ অবকাশই পেয়ে যায়, যার আশায় তারা বুক বেঁধেছে, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, যখনই তাদের ওপর আদ, সামূদ বা লূতের জাতি অথবা আইকাবাসীদের মতো কোন আকস্মিক বিপর্যয় আপতিত হবে, যার হাত থেকে, নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা কারো কাছে নেই অথবা অন্য কিছু না হলেও অন্তত মৃত্যুর শেষ মুহূর্তই এসে পৌঁছুবে, যার বেষ্টনী ভেদ করে পালাবার সাধ্য কারোর নেই, তাহলে সে সময় দুনিয়ার আয়েশ আরাম করার এ কয়েকটি বছর তাদের জন্য কি লাভজনক প্রমাণিত হবে?

১২৯. অর্থাৎ যখন তারা সতর্ককারীদের সতর্কবাণী এবং উপদেশ দাতাদের উপদেশ গ্রহণ করেনি এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম তখন একথা সুস্পষ্ট যে, এটা আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কোন জুলুম ছিল না। ধ্বংস করার আগে তাদেরকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা না করা হলে অবশ্য তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে একথা বলা যেতো।

১৩০. প্রথমে এ বিষয়টির ইতিবাচক দিকের কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এটি রব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত কিতাব এবং রুহুল আমীন এটি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। এখন নেতিবাচক দিক বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হয়েছে, শয়তানরা একে নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি, যেমন সত্যের দুশমনরা দোষারোপ করছে। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যে মিথ্যার

অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল সেখানে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল এই যে, কুরআনের আকারে যে বিস্ময়কর বাণী মানুষের সামনে আসছিল এবং তাদের হৃদয়ের গভীরে অনুপ্রবেশ করে চলছিল তার কি ব্যাখ্যা করা যায়। এ বাণী মানুষের কাছে পৌঁছাবার পথ বন্ধ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। লোকদের মনে এ সম্পর্কে কুধারণার সৃষ্টি করা এবং এর প্রভাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, এটাই ছিল এখন তাদের জন্য একটি পেরেশানীর ব্যাপার। এ পেরেশানীর অবস্থার মধ্যে তারা জনগণের মধ্যে যেসব অপবাদ ছড়িয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাউযুবিল্লাহ একজন গণৎকার এবং সধারণ গণৎকারদের মতো তাঁর মনের মধ্যেও এ বাণী শয়তানরা সঞ্চার করে দেয়। এ অপবাদটিকে তারা নিজেদের সবচেয়ে বেশী কার্যকর হাতিয়ার মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল, এ বাণী কোন ফেরেশতা নিয়ে আসে না শয়তান, কারো কাছে একথা যাচাই করার কি মাধ্যমই বা থাকতে পারে এবং শয়তান মনের মধ্যে সঞ্চার করে দেয়, এ অভিযোগের প্রতিবাদ যদি কেউ করতে চায় তাহলে কিভাবে করবে?

১৩১. অর্থাৎ এ বাণী এবং এ বিষয়বস্তু শয়তানের মুখে তো সাজেই না। যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারে, কুরআনে যেসব কথা বর্ণনা করা হচ্ছে সেগুলো কি শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে? তোমাদের জনপদগুলোতে কি গণৎকার নেই এবং শয়তানদের সাথে যোগসাজস করে যেসব কথা এ ব্যক্তি বলছেন তা কখনো তোমরা কোথাও শুনেছো? তোমরা কি কখনো শুনেছো, কোন শয়তান কোন গণৎকারের মাধ্যমে লোকদেরকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহকে ভয় করার শিক্ষা দিয়েছে? শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে বিরত রেখেছে? পরকালে জিজ্ঞাসাবাদ করার ভয় দেখিয়েছে? জুলুম-নিপীড়ন, অসৎ-অশ্লীল কাজ ও নৈতিকতা বিগর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে? সৎপথে চলা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন এবং আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সদাচার করার উপদেশ দিয়েছে? শয়তানরা এ প্রকৃতি কোথায় পাবে? তাদের স্বভাব হচ্ছে, তারা মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে অসৎকাজে উৎসাহিত করে। তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী গণকদের কাছে লোকেরা যে কথা জিজ্ঞেস করতে যায় তা হচ্ছে এই যে, প্রেমিক তার প্রেমিকাকে পাবে কি না? জুয়ায় কোন্ দাঁওটা মারলে লাভ হবে? শত্রুকে হেয় করার জন্য কোন্ চালটা চালতে হবে? অমুক ব্যক্তির উট কে চুরি করেছে? এসব সমস্যা ও বিষয় বাদ দিয়ে গণক ও তার পৃষ্ঠপোষক শয়তানরা আবার কবে থেকে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণ ও সংস্কারের শিক্ষা এবং অসৎ কাজে বাধা দেবার ও সেগুলো উৎখাত করার চিন্তা-ভাবনা করেছে?

১৩২. অর্থাৎ শয়তানরা করতে চাইলেও একাজ করার ক্ষমতাই তাদের নেই। সামান্য সময়ের জন্যও নিজেদেরকে মানুষের যথার্থ শিক্ষক ও প্রকৃত আত্মশুদ্ধিকারীর স্থানে বসিয়ে কুরআন যে নির্ভেজাল সত্য ও নির্ভেজাল কল্যাণের শিক্ষা দিচ্ছে সে শিক্ষা দিতে তারা সক্ষম নয়। প্রতারণা করার জন্যও যদি তারা এ কৃত্রিম রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তাদের কাজ এমন মিশ্রনমুক্ত হতে পারে না, যাতে তাদের মূর্খতা ও তাদের মধ্যে লুকানো শয়তানী স্বভাবের প্রকাশ হবে না। যে ব্যক্তি শয়তানদের 'ইল্হাম' তথা আসমানী প্রেরণা লাভ করে নেতা হয়ে বসে তার জীবনেও তার শিক্ষার মধ্যে অনিবার্যভাবে নিয়তের

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٣﴾ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٥﴾ فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٦﴾

কাজেই হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদকে ডেকো না, নয়তো তুমিও শাস্তি লাভকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।[১৩৪] নিজের নিকটতম আত্মীয়–পরিজনদেরকে ভয় দেখাও[১৩৫] এবং মু'মিনদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করো। কিন্তু যদি তারা তোমার নাফরমানী করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যাকিছু করো আমি তা থেকে দায়মুক্ত।[১৩৬]

ত্রুটি, সংকল্পের অপবিত্রতা ও উদ্দেশ্যের মালিন্য দেখা দেবেই। নির্ভেজাল সততা ও নির্ভেজাল সৎকর্মশীলতা কোন শয়তান মানুষের মনে সঞ্চার করতে পারে না এবং শয়তানের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী কখনো এর ধারক হতে পারে না। এরপর আছে শিক্ষার উন্নত মান ও পবিত্রতা এবং এর ওপর বাড়তি সুনিপুন বাগধারা ও সাহিত্য–অলংকার এবং গভীর তত্বজ্ঞান, যা কুরআনে পাওয়া যায়। এরি ভিত্তিতে কুরআনে বারবার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, মানুষ ও জিনেরা মিলে চেষ্টা করলেও এ কিতাবের মতো কিছু একটা রচনা করে আনতে পারবে না ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا (بنى اسرائيل : ٨٨)

قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (يونس : ٣٨)

১৩৩. অর্থাৎ কুরআনের বাণী হৃদয়ে সঞ্চার করার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে রুহুল আমীন তা নিয়ে চলতে থাকেন এবং যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোরাজ্যে তিনি তা নাযিল করেন তখন এ সমগ্র ধারাবাহিক কার্যক্রমের কোন এক জায়গায়ও শয়তানদের কান লাগিয়ে শোনারও কোন সুযোগ মেলে না। আশেপাশে কোথাও তাদের ঘুরে বেড়াবার কোন অবকাশই দেয়া হয়না। কোথাও থেকে কোনভাবে কিছু শুনে টুনে দু'একটি কথা চুরি করে নিয়ে গিয়ে তারা নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের বলতে পারতো না যে, আজ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বাণী শুনাবেন অথবা তাঁর ভাষণে অমুক কথা বলা হবে। (আরো বেশী

জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল হিজ্‌র ৮–১২ ও আস সাফ্‌ফাত ৫–৭ টীকা এবং সূরা আল জিন ৮– ৯ ও ২৭ আয়াত)

১৩৪. এর অর্থ এ নয়, নাউযুবিল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শিরকের অপরাধ সংঘটিত হবার ভয় ছিল এবং এজন্য তাঁকে ধমক দিয়ে এ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। আসলে কাফের ও মুশরিকদেরকে সতর্ক করাই এর উদ্দেশ্য। বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, কুরআন মজীদে যে শিক্ষা পেশ করা হচ্ছে। তা যেহেতু বিশ্ব–জাহানের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ভেজাল সত্য এবং তার মধ্যে শয়তানী মিশ্রণের সামান্যও দখল নেই, তাই এখানে সত্যের ব্যাপারে কাউকে কোন প্রকার সুযোগ–সুবিধা দেবার কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় যদি কেউ হতে পারেন তবে তিনি হচ্ছেন তাঁর রসূল। কিন্তু ধরে নেয়া যাক যদি তিনিও বন্দেগীর পথ থেকে এক তিল পরিমাণ সরে যান এবং এক আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ হিসেবে ডাকেন তাহলে পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবেন না। এক্ষেত্রে অন্যেরা তো ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই যখন কোন সুবিধা দেয়া হয়নি তখন আর কোন্ ব্যক্তি আছে যে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় কাউকে শরীক করার পর আবার এ আশা করতে পারে যে, সে রক্ষা পেয়ে যাবে অথবা কেউ তাকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে।

১৩৫. অর্থাৎ আল্লাহর এ পবিত্র পরিচ্ছন্ন দীনের মধ্যে যেমন নবীকে কোন সুবিধা দেয়া হয়নি ঠিক তেমনি নবীর পরিবার ও তাঁর নিকটতম আত্মীয়–বান্ধবদের জন্যও কোন সুবিধার অবকাশ রাখা হয়নি। এখানে যার সাথেই কিছু করা হয়েছে তার গুণাগুণের (Merits) প্রেক্ষিতেই করা হয়েছে। কারো বংশ মর্যাদা বা কারো সাথে কোন ব্যক্তির সম্পর্ক কোন উপকার করতে পারে না। পথ ভ্রষ্টতা ও অসৎকর্মের জন্য আল্লাহর আযাবের ভয় সবার জন্য সমান। এমন নয় যে, অন্য সবাই তো এসব জিনিসের জন্য পাকড়াও হবে কিন্তু নবীর আত্মীয়রা রক্ষা পেয়ে যাবে। তাই হুকুম দেয়া হয়েছে, নিজের নিকটতম আত্মীয়দেরকেও পরিষ্কার ভাষায় সতর্ক করে দাও। যদি তারা নিজেদের আকীদা–বিশ্বাস ও কার্যকলাপ পরিচ্ছন্ন না রাখে তাহলে তারা যে নবীর আত্মীয় একথা তাদের কোন কাজে লাগবেনা।

নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে, এ আয়াত নাযিল হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার আগে নিজের দাদার সন্তানদের ডাকলেন এবং তাদের একেকজনকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

يَابَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، يَا عَبَّاسُ ، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللّٰهِ ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ، اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، فَاِنِّى لاَ اَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ، سَلُوْنِى مِنْ مَالِى مَا شِئْتُمْ –

"হে বনী আবদুল মুত্তালিব, হে আব্বাস, হে আল্লাহর রসূলের ফুফী সফীয়াহ, হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা, তোমরা আগুনের আযাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার

চিন্তা করো। আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারবো না। তবে হাঁ, আমার ধন–সম্পত্তি থেকে তোমরা যা চাও চাইতে পারো।"

তারপর তিনি অতি প্রত্যুষে সাফা পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন ঃ يا صباحاه (হায়, সকালের বিপদ!) হে কুরাইশের লোকেরা! হে বনী কা'ব ইবনে লুআই! হে বনী মুররা! হে কুসাইর সন্তান সন্ততিরা! হে বনী আবদে মান্নাফ! হে বনী আব্দে শাম্স! হে বনী হাশেম, হে বনী আবদুল মুত্তালিব! এভাবে কুরাইশদের প্রত্যেকটি গোত্র ও পরিবারের নাম ধরে ধরে তিনি আওয়াজ দেন। আরবে একটি প্রচলিত নিয়ম ছিল, অতি প্রত্যুষে যখন কোন বহিশত্রুর হামলার আশংকা দেখা দিতো, ওয়াকিফহাল ব্যক্তি এভাবেই সবাইকে ডাকতো এবং লোকেরা তার আওয়াজ শুনতেই চারদিক থেকে দৌড়ে যেতো। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আওয়াজ শুনে লোকেরা যার যার ঘর থেকে বের হয়ে এলো। তখন তিনি বললেন ঃ "হে লোকেরা! যদি আমি বলি, এ পাহাড়ের পেছনে একটি বিশাল সেনাবাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য ওৎ পেতে আছে। তাহলে কি তোমরা আমার কথা সত্য বলে মেনে নেবে?" সবাই বললো, হ্যাঁ আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তুমি কখনো মিথ্যা বলনি। তিনি বললেন, "বেশ, তাহলে আমি আল্লাহর কঠিন আযাব আসার আগে তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। তাঁর পাকড়াও থেকে নিজেদের বাঁচাবার চিন্তা করো। আল্লাহর মোকাবিলায় আমি তোমাদের কোন কাজে লাগতে পারবোনা। কিয়ামতের দিন কেবলমাত্র মুত্তাকীরাই হবে আমার আত্মীয়। এমন যেন না হয়, অন্য লোকেরা সৎকাজ নিয়ে আসবে এবং তোমরা দুনিয়ার জঞ্জাল মাথায় করে নিয়ে উপস্থিত হবে। সে সময় তোমরা ডাকবে, হে মুহাম্মাদ! কিন্তু আমি তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবো। তবে দুনিয়ায় আমার সাথে তোমাদের রক্তের সম্পর্ক এবং এখানে আমি তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবো।" এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অনেকগুলো হাদীস বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত আয়েশা, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত যুহাইর ইবনে আমর ও হযরত কুবাইসাহ ইবনে মাহারিক থেকে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনে وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ –এর হুকুম হলো এবং নবী (সা) তাঁর আত্মীয়দেরকে একত্র করে একথা জানিয়ে দিয়ে সে হুকুম তামিল করলেন, ব্যাপারটির এখানেই শেষ নয়। আসলে এর মধ্যে যে মূলনীতি সুস্পষ্ট করা হয়েছিল তা ছিল এই যে, দীনের মধ্যে নবী ও তাঁর বংশের জন্য এমন কোন বিশেষ সুবিধা নেই যা থেকে অন্যরা বঞ্চিত। যে জিনিসটি প্রাণ সংহারক বিষ সেটি সবারই জন্য প্রাণ সংহারক। নবীর কাজ হচ্ছে সবার আগে নিজে তা থেকে বাঁচবেন এবং নিজের নিকবর্তী লোকদেরকে তার ভয় দেখাবেন। তারপর সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে এ মর্মে সতর্ক করে দেবেন যে, এটি যে–ই খাবে সে–ই মারা পড়বে। আর যে জিনিসটি লাভজনক তা সবার জন্য লাভজনক। নবীর দায়িত্ব হচ্ছে, সবার আগে তিনি নিজে সেটি অবলম্বন করবেন এবং নিজের আত্মীয়দেরকে সেটি অবলম্বন করার উপদেশ দেবেন। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি দেখে নেবে এ ওয়াজ–নসিহত শুধুমাত্র অন্যের জন্য নয় বরং নিজের

দাওয়াতের ব্যাপারে নবী আন্তরিক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবন এ পদ্ধতি অবলম্বন করে গেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন যখন তিনি শহরে প্রবেশ করলেন তখন ঘোষণা করে দিলেন ঃ

كُلُّ رِبَافِى الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِى هَاتَيْنِ وَاَوَّلُ مَا اَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ -

"লোকদের কাছে অনাদায়কৃত জাহেলী যুগের প্রত্যেকটি সুদ আমার এ দু'পায়ের তলে পিষ্ট করা হয়েছে। আর সবার আগে যে সূদকে আমি রহিত করে দিচ্ছি তা হচ্ছে আমার চাচা আব্বাসের পাওনা সূদ।"

(উল্লেখ্য, সূদ হারাম হবার আগে হযরত আব্বাস (রা) সূদে টাকা খাটাতেন এবং সে সময় পর্যন্ত লোকদের কাছে তাঁর বহু টাকার সূদ পাওনা ছিল) একবার চুরির অভিযোগে তিনি কুরাইশদের ফাতিমা নামের একটি মেয়ের হাত কাটার হুকুম দিলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) তার পক্ষে সুপারিশ করলেন। এতে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করতো তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম।

১৩৬. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তোমার আত্মীয় পরিজনদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনে তোমার অনুসরণ করবে তাদের সাথে কোমল, স্নেহপূর্ণ ও বিনম্র ব্যবহার করো। আর যারা তোমার কথা মানবে না তাদের দায়মুক্ত হবার কথা ঘোষণা করে দাও। দুই, যেসব আত্মীয়কে সতর্ক করার হুকুম দেয়া হয়েছিল এ উক্তি কেবলমাত্র তাদের সাথে সম্পর্কিত নয় বরং এটি ব্যাপকভাবে সবার জন্য। অর্থাৎ যারা ঈমান এনে তোমার আনুগত্য করে তাদের সাথে বিনম্র আচরণ করো এবং যারাই তোমার নাফরমানি করে তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দাও যে, তোমাদের কার্যকলাপের সমস্ত দায় দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।

এ আয়াত থেকে জানা যায়, সে সময় কুরাইশ ও তার আশেপাশের আরববাসীদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছিল কিন্তু কার্যত তারা তাঁর আনুগত্য করছিল না বরং তারা যথারীতি তাঁদের ভ্রষ্ঠ ও বিভ্রান্ত সমাজ কাঠামোর মধ্যে ঠিক তেমনিভাবে জীবন যাপন করে যাচ্ছিল যেমন অন্যান্য কাফেররা করছিল। আল্লাহ এ ধরনের স্বীকৃতি দানকারীদেরকে এমন সব মু'মিনদের থেকে আলাদা গণ্য করেছিলেন যাঁরা নবীর (সা) স্বীকৃতি দান করার পর তাঁর আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করেছিল। বিনম্র ব্যবহার করার হুকুম শুধুমাত্র এ শেষোক্ত দলটির জন্য দেয়া হয়েছিল। আর যারা নবীর (সা) আনুগত্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, যার মধ্যে তাঁর সত্যতা স্বীকারকারীও এবং তাঁকে অস্বীকারকারীও ছিল, তাদের সম্পর্কে নবীকে (সা) নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা প্রকাশ করে দাও এবং পরিষ্কার বলে দাও, নিজেদের কর্মকাণ্ডের ফলাফলে তোমরা নিজেরাই ভুগবে এবং তোমাদের সতর্ক করে দেবার পর এখন আর তোমাদের কোন কাজের দায়–দায়িত্ব আমার ওপর নেই।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

আর সেই পরাক্রান্ত ও দয়াময়ের ওপর নির্ভর করো[১৩৭] যিনি তোমাকে দেখতে থাকেন যখন তুমি ওঠো[১৩৮] এবং সিজ্‌দাকারীদের মধ্যে তোমার ওঠা–বসা ও নড়া চড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।[১৩৯] তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

১৩৭. অর্থাৎ দুনিয়ার বৃহত্তম শক্তিরও পরোয়া করো না এবং মহাপরাক্রমশালী ও দয়াময় সত্তার ওপর নির্ভর করে কাজ করে যাও। তাঁর পরাক্রমশালী হওয়াই একথার নিশ্চয়তা বিধান করে যে, যার পেছনে তাঁর সমর্থন আছে তাকে দুনিয়ায় কেউ হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে না। আর তাঁর দয়াময় হওয়া এ নিশ্চিন্ততার জন্য যথেষ্ট যে, তাঁর জন্য যে ব্যক্তি সত্যের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার কাজে জীবন উৎসর্গ করবে তার প্রচেষ্টাকে তিনি কখনো নিষ্ফল হতে দেবেন না।

১৩৮. ওঠার অর্থ রাতে নামাযের জন্য ওঠাও হতে পারে, আবার রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য ওঠাও হতে পারে।

১৩৯. এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, আপনি যখন জামায়াতের সাথে নামায পড়ার সময় নিজের মুকতাদীদের সাথে ওঠা–বসা ও রুকূ'–সিজ্‌দা করেন তখন আল্লাহ আপনাকে দেখতে থাকেন। দুই, রাতের বেলা উঠে যখন নিজের সাথিরা (যাদের বৈশিষ্টসূচক গুণ হিসেবে "সিজ্‌দাকারী" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) তাদের পরকাল গড়ার জন্য কেমন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তা দেখার উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকেন তখন আপনি আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকেন না। তিন, আপনি নিজের সিজ্‌দাকারী সাথিদেরকে সংগে নিয়ে আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করার জন্য যেসব প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ তা অবগত আছেন। চার, সিজ্‌দাকারী লোকদের দলে আপনার যাবতীয় তৎপরতা আল্লাহর নজরে আছে। তিনি জানেন আপনি কিভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, কিভাবে ও কেমন পর্যায়ে তাদের আত্মশুদ্ধি করছেন এবং কিভাবে ভেজাল সোনাকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের এসব গুণের উল্লেখ এখানে যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তার সম্পর্ক ওপরের বিষয়বস্তুর সাথেও এবং সামনের বিষয়বস্তুর সাথেও আছে। ওপরের বিষয়বস্তুর সাথে তার সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহমত ও তাঁর শক্তিশালী সমর্থনলাভের যোগ্য। কারণ আল্লাহ কোন অন্ধ ও বধির মাবুদ নন বরং একজন চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন শাসক। তাঁর পথে আপনার সংগ্রাম–সাধনা এবং সিজদাকারী সাথিদের মধ্যে আপনার তৎপরতা সবকিছু তাঁর দৃষ্টিতে আছে। পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে এর সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো যে ব্যক্তির জীবন এবং যার সাথিদের গুণাবলী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথিদের মতো, তার ওপর শয়তান অবতীর্ণ

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾
أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾

হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের জানাবো শয়তানরা কার ওপর অবতীর্ণ হয়? তারা তো প্রত্যেক জালিয়াত বদকারের ওপর অবতীর্ণ হয়।[১৪০] শোনা কথা কানে ঢুকিয়ে দেয় এবং এর বেশীর ভাগই হয় মিথ্যা।[১৪১]

আর কবিরা! তাদের পেছনে চলে পথভ্রান্ত যারা।[১৪২] তুমি কি দেখো না তারা উপত্যকায় উপত্যকায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়[১৪৩] এবং এমনসব কথা বলে যা তারা করে না?[১৪৪]

হয় অথবা সে কবি—একথা কেবলমাত্র একজন বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তিই বলতে পারে। শয়তান যেসব গণকের কাছে আসে তাদের এবং কবি ও তাদের সাথি সহযোগীদের আচার আচরণ কেমন হয়ে থাকে তা কি কারো অজানা? তোমাদের নিজেদের সমাজে এ ধরনের লোক বিপুল সংখ্যায় পাওয়া যায়। কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি ঈমানদারীর সাথে একথা বলতে পারে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিদের জীবন এবং কবি ও গণকদের জীবনের মধ্যে কোন ফারাক দেখে না? এখন এর চেয়ে বড় বেহায়াপনা আর কি হতে পারে যে, আল্লাহর এ বান্দাদেরকে প্রকাশ্যে কবি ও গণৎকার বলে পরিহাস করা হচ্ছে অথচ কেউ একটু লজ্জাও অনুভব করছে না।

১৪০. এখানে গণৎকার, জ্যোতিষী, ভবিষ্যত বক্তা, "আমলকারী" ইত্যাদি লোক, যারা ভবিষ্যতের খবর জানে বলে ভণ্ড প্রতারকের অভিনয় করে অথবা যারা দ্ব্যর্থবোধক শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করে মানুষের ভাগ্য গণনা করে কিংবা ধড়িবাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জিন, আত্মা ও মক্কেলদের সহায়তায় মানুষের সংকট নিরসনের ব্যবসায় করে থাকে তাদের কথা বলা হয়েছে।

১৪১. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, শয়তানরা কিছু শুনেটুনে নিয়ে নিজেদের চেলাদেরকে জানিয়ে দেয় এবং তাতে সামান্যতম সত্যের সাথে বিপুল পরিমাণ মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায়। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, মিথ্যুক-প্রতারক গণৎকাররা শয়তানের কাছ থেকে কিছু শুনে নেয় এবং তারপর তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে অনেকটা মিথ্যা মিশিয়ে মানুষের কানে ফুঁকে দিতে থাকে। একটি হাদীসে এর আলোচনা এসেছে। হাদীসটি বুখারী শরীফে হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ কোন কোন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গণকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। জবাবে তিনি বলেন, ওসব কিছুই নয়। তারা বলে, হে আল্লাহর রসূল! কখনো কখনো তারা তো আবার ঠিক সত্যি কথাই বলে দেয়। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সত্যি

কথাটা কখনো কখনো জিনেরা নিয়ে আসে এবং তাদের বন্ধুদের কানে ফুঁকে দেয় তারপর তারা তার সাথে নানা রকম মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি কাহিনী তৈরি করে।

১৪২. অর্থাৎ কবিদের সাথে যারা থাকে ও চলাফেরা করে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাদেরকে চলাফেরা করতে তোমরা দেখছো তাদের থেকে স্বভাবে-চরিত্রে, চলনে-বলনে, অভ্যাসে-মেজাজে সম্পূর্ণ আলাদা। উভয় দলের ফারাকটা এতই সুস্পষ্ট যে, এক নজর দেখার পর যে কোন ব্যক্তি উভয় দলের কোন্‌টি কেমন তা চিহ্নিত করতে পারে। একদিকে আছে একান্ত ধীর-স্থির ও শান্ত শিষ্ঠ আচরণ, ভদ্র ও মার্জিত রুচি এবং সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহভীতি। প্রতিটি কথায় ও কাজে আছে দায়িত্বশীলতার অনুভূতি। আচার-ব্যবহারে মানুষের অধিকারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি। লেনদেনে চূড়ান্ত পর্যায়ের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা। কথা যখনই বলা হয় শুধুমাত্র কল্যাণ ও ন্যায়ের জন্যই বলা হয়, অকল্যাণ বা অন্যায়ের একটি শব্দও কখনো উচ্চারিত হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, এদেরকে দেখে পরিষ্কার জানা যায়, এদের সামনে রয়েছে একটি উন্নত ও পবিত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ, এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জনের নেশায় এরা রাতদিন সংগ্রাম করে চলছে এবং এদের সমগ্র জীবন একটি উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হয়েছে। অন্যদিকে অবস্থা হচ্ছে এই যে, সেখানে কোথাও প্রেম চর্চা ও শরাব পানের বিষয় আলোচিত হচ্ছে এবং শ্রোতৃবর্গ লাফিয়ে লাফিয়ে তাতে বাহবা দিচ্ছে। কোথাও কোন দেহপশারিণী অথবা কোন পুরনারী বা গৃহ-ললনার সৌন্দর্যের আলোচনা চলছে এবং শ্রোতারা খুব স্বাদ নিয়ে নিয়ে তা শুনছে "কোথাও অশ্লীল কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে এবং সমগ্র সমাবেশের ওপর যৌন কামনার প্রেত চড়াও হয়ে বসেছে। কোথাও মিথ্যা ও ভাঁড়ামির আসর বসেছে এবং সমগ্র মাহফিল ঠাট্টা-তামাশায় মশগুল হয়ে গেছে। কোথাও কারো দুর্নাম গাওয়া ও নিন্দাবাদ করা হচ্ছে এবং লোকেরা তাতে বেশ মজা পাচ্ছে। কোথাও কারো অযথা প্রশংসা করা হচ্ছে এবং শাবাশ ও বাহবা দিয়ে তাকে আরো উসকিয়ে দেয়া হচ্ছে। আবার কোথাও কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তা শুনে মানুষের মনে আগুন লেগে যাচ্ছে। এসব মজলিসে কবির কবিতা শোনার জন্য যে বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত হয় এবং বড় বড় কবিদের পেছনে যেসব লোক ঘুরে বেড়ায় তাদেরকে দেখে কোন ব্যক্তি একথা অনুভব না করে থাকতে পারে না যে, এরা হচ্ছে নৈতিকতার বন্ধনমুক্ত, আবেগ ও কামনার স্রোতে ভেসে চলা এবং ভোগ ও পাপ-পঙ্কিলতার পূজারী অর্ধ-পাশবিক একটি নরগোষ্ঠী দুনিয়ায় মানুষের যে কোন উন্নত জীবনাদর্শ ও লক্ষও থাকতে পারে—এ চিন্তা কখনো এদের মন-মগজ স্পর্শও করতে পারে না। এ দু'দলের সুস্পষ্ট পার্থক্য ও ফারাক যদি কারো নজরে না পড়ে তাহলে সে অন্ধ। আর যদি সবকিছু দেখার পরও কোন ব্যক্তি নিছক সত্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ঈমানকে বেমালুম হজম করে একথা বলতে থাকে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর আশেপাশে যারা সমবেত হয়েছে তারা কবি ও কবিদের সাংগোপাংগদের মতো, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তারা মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে নির্লজ্জতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেছে।

১৪৩. অর্থাৎ তাদের নিজস্ব চিন্তার ও বাকশক্তি ব্যবহার করার কোন একটি নির্ধারিত পথ নেই। বরং তাদের চিন্তার পাগলা ঘোড়া বল্‌গাহারা অশ্বের মতো পথে বিপথে মাঠে

ঘাটে সর্বত্র উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়ায়। আবেগ, কামনা–বাসনা বা স্বার্থের প্রতিটি নতুন ধারা তাদের কন্ঠ থেকে একটি নতুন বিষয়ের রূপে আবির্ভূত হয়। চিন্তা ও বর্ণনা করার সময় এগুলো সত্য ও ন্যায়সংগত কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখার কোন প্রয়োজনই অনুভব করা হয় না। কখনো একটি তরংগ জাগে, তখন তার স্বপক্ষে জ্ঞান ও নীতিকথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে দেয়া হয়। আবার কখনো দ্বিতীয় তরংগ জাগে, সেই একই কণ্ঠ থেকে এবার একেবারেই পূতিগন্ধময় নীচ, হীন ও নিম্নমুখী আবেগ উৎসারিত হতে থাকে। কখনো কারোর প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাকে আকাশে চড়িয়ে দেয়া হয় আবার কখনো নারাজ হলে সেই একই ব্যক্তিকেই পাতালের গভীর গর্তে ঠেলে দেয়া হয়। কোন কৃপণকে হাতেম এবং কোন কাপুরুষকে বীর রুস্তম গণ্য করতে তাদের বিবেকে একটুও বাধে না যদি তার সাথে তাদের কোন স্বার্থ জড়িত থাকে। পক্ষান্তরে কেউ যদি তাদেরকে কোন দুঃখ দিয়ে থাকে তাহলে তার পবিত্র জীবনকে কলংকিত করার এবং তার ইজ্জত–আবরু ধূলায় মিশিয়ে দেবার বরং তার বংশধারার নিন্দা করার ব্যাপারে তারা একটুও লজ্জা অনুভব করে না। আল্লাহ বিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদ, বস্তুবাদিতা ও আধ্যাত্মিকতা, সদাচার ও অসদাচার, পবিত্রতা–পরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা–অপরিচ্ছন্নতা, গাম্ভীর্য ও হাস্য–কৌতুক এবং প্রশংসা ও নিন্দাবাদ সবকিছু একই কবির একই কাব্যে পাশাপাশি দেখা যাবে। কবিদের এ পরিচিত বৈশিষ্ট যারা জানে তারা কেমন করে এ কুরআনের বাহককে কবিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারে? কারণ তাঁর ভাষণ মাপাজোকা, তাঁর বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন, তাঁর পথ একেবারে সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত এবং সত্য, সততা, ন্যায় ও কল্যাণের দিকে আহবান করা ছাড়া তাঁর কণ্ঠ থেকে অন্য কোন কথাই বের হয়নি।

কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, কবিত্বের সাথে তাঁর প্রকৃতি ও মেজাজের আদৌ কোন সম্পর্কই নেই ঃ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ –

"আমি তাকে কবিতা শিখাইনি এবং এটা তার করার মতো কাজও নয়।"

(ইয়াসীন, ৬৯)

এটি এমন একটি সত্য ছিল, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন তাঁরা সবাই একথা জানতেন। নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ কোন একটি কবিতাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরোপুরি মুখস্ত ছিল না। কথাবার্তার মাঝখানে কোন কবির ভালো কবিতার চরণ তাঁর মুখে এলেও তা অনুপযোগীভাবে পড়ে যেতেন অথবা তার মধ্যে শব্দের হেরফের হয়ে যেতো। হযরত হাসান বাসরী বলেন, একবার ভাষণের মাঝখানে তিনি এক কবির কবিতার চরণ এভাবে পড়লেন ঃ

كفى بالاسلام والشيب للمرء ناهيا –

হযরত আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! চরণটি হবে এ রকম,

كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا –

একবার তিনি আব্বাস ইবনে মিরদাস সুলামীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কবিতাটা কি তোমার ঃ

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبِيْدِ وَبَيْنَ الْاَقْرَعِ وَعَيَيْنَهِ –

আব্বাস বললেন, শেষ বাক্যাংশটি ওভাবে নয় বরং এভাবে হবে ঃ بين عيينة والاقرع একথায় রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কিন্তু অর্থ তো উভয়ের এক।

হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করা হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কখনো নিজের ভাষণের মধ্যে কবিতা ব্যবহার করতেন? তিনি বলেন, কবিতার চেয়ে বেশী তিনি কোন জিনিসকে ঘৃণা করতেন না। তবে কখনো কখনো তিনি বনী কায়েসের কবিতা পড়তেন। কিন্তু প্রথমটা শেষে এবং শেষেরটা প্রথম দিকে পড়ে ফেলতেন। হযরত আবু বকর (রা) বলতেন, হে আল্লাহর রসূল! এভাবে নয় বরং এভাবে। তখন তিনি বলতেন, "আমি কবি নই এবং কবিতা পাঠ করা আমার কাজ নয়।" আরবের কবিতা অংগনে যে ধরনের বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছিল তা ছিল যৌন আবেদন ও অবৈধ প্রেমচর্চা অথবা শরাব পান কিংবা গোত্রীয় ঘৃণা, বিদ্বেষ ও যুদ্ধবিগ্রহ বা বংশীয় ও বর্ণগত অহংকার। কল্যাণ ও সুকৃতির কথার স্থান সেখানে অতি অল্পই ছিল। এ ছাড়া মিথ্যা, অতিরঞ্জন, অপবাদ, নিন্দাবাদ, অযথা প্রশংসা, আত্মগর্ব, তিরস্কার, দোষারোপ, পরিহাস ও মুশরিকী অশ্লীল পৌরানিকতা তো এ কাব্যধারার শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল। তাই এ কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রায় ছিল ঃ

لَاَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا

"তোমাদের কারো পেট পুঁজে ভরা থাকা কবিতায় ভরা থাকার চেয়ে ভালো। তবুও যে কবিতায় কোন ভালো কথা থাকতো তিনি তার প্রশংসা করতেন। তাঁর উক্তি ছিল ঃ امن شعره وكفر قلبه "তার কবিতা মু'মিন কিন্তু অন্তর কাফের।" একবার একজন সাহাবী একশোটা ভালো ভালো কবিতা তাঁকে শুনান এবং তিনি বলে যেতে থাকলে বলেন ঃ هيه অর্থাৎ "আরো শুনাও।"

১৪৪. এটি হচ্ছে কবিদের আরেকটি বৈশিষ্ট। এটি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের কর্মধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। নবী (সা) সম্পর্কে তাঁর প্রত্যেক পরিচিত জন জানতেন, তিনি যা বলতেন তাই করতেন এবং যা করতেন তাই বলতেন। তাঁর কথা ও কর্মের সামঞ্জস্য এমনই একটি জাজ্বল্যমান সত্য ছিল যা তাঁর আশেপাশের সমাজের কেউ অস্বীকার করতে পারতো না। অথচ সাধারণ কবিদের সম্পর্কে সবাই জানতো যে, তারা বলতেন এক কথা এবং করতেন অন্য কিছু। তাদের কবিতায় দানশীলতার মাহাত্ম এমন উচ্চ কণ্ঠে প্রচারিত হবে যেন মনে হবে তাদের চেয়ে বড় আর কোন দাতা নেই। কিন্তু তাদের কাজ দেখলে বুঝা যাবে তারা বড়ই কৃপণ। বীরত্বের কথা তারা বলবেন কিন্তু নিজেরা হবেন কাপুরুষ। অমুখাপেক্ষিতা, অল্পে তুষ্টি ও আত্মমর্যাদাবোধ হবে তাদের কবিতার বিষয়বস্তু কিন্তু নিজেরা লোভ, লালসা ও আত্ম বিক্রয়ের শেষ সীমানাও পার হয়ে যাবেন। অন্যের সামান্যতম দুর্বলতাকেও কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন কিন্তু নিজেরা চরম দুর্বলতার মধ্যে হাবুডুবু খাবেন।

إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿٢٢٧﴾

তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে আর তাদের প্রতি জুলুম করা হলে শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেয়।[১৪৫]— আর জুলুমকারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের পরিণাম কি।[১৪৬]

১৪৫. ওপরে সাধারণভাবে কবিদের প্রতি যে নিন্দাবাদ উচ্চারিত হয়েছে তা থেকে এমন সব কবিদেরকে এখানে আলাদা করা হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে চারটি বৈশিষ্ট।

এক ঃ যারা মু'মিন অর্থাৎ আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবগুলো যারা মানেন এবং আখেরাত বিশ্বাস করেন।

দুই ঃ নিজেদের কর্মজীবনে যারা সৎ, যারা ফাসেক, দুষ্কৃতকারী ও বদকার নন। নৈতিকতার বাঁধন মুক্ত হয়ে যারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দেন।

তিন ঃ আল্লাহকে যারা বেশী বেশী করে স্মরণ করেন নিজেদের সাধারণ অবস্থায়, সাধারণ সময়ে এবং নিজেদের রচনায়ও। তাদের ব্যক্তি জীবনে আল্লাহভীতি ও আল্লাহর আনুগত্য রয়েছে কিন্তু তাদের কবিতা পাপ–পংকিলতা, লালসা ও কামনা রসে পরিপূর্ণ, এমন যেন না হয়। আবার এমনও যেন না হয়, কবিতায় বড়ই প্রজ্ঞা ও গভীর তত্ত্বকথা আওড়ানো হচ্ছে কিন্তু ব্যক্তি জীবনে আল্লাহর স্মরণের কোন চিহ্নই নেই। আসলে এ দু'টি অবস্থা সমানভাবে নিন্দনীয়। তিনিই একজন পছন্দনীয় কবি যার ব্যক্তিজীবন যেমন আল্লাহর স্মরণে পরিপূর্ণ তেমনি নিজের সমগ্র কাব্য প্রতিভাও এমন পথে উৎসর্গীকৃত যা আল্লাহ থেকে গাফিল লোকদের নয় বরং যারা আল্লাহকে জানে, আল্লাহকে ভালোবাসে ও আল্লাহর আনুগত্য করে তাদের পথ।

চতুর্থ বৈশিষ্টটি বর্ণনা করা হয়েছে এমন সব ব্যতিক্রমধর্মী কবিদের যারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কারোর নিন্দা করে না এবং ব্যক্তিগত, বংশীয় বা গোত্রীয় বিদ্বেষে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বালায় না। কিন্তু যখন জালেমের মোকাবিলায় সত্যের প্রতি সমর্থন দানের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন তার কন্ঠকে সেই একই কাজে ব্যবহার করে যে কাজে একজন মুজাহিদ তার তীর ও তরবারিকে ব্যবহার করে। সবসময় আবেদন নিবেদন করতেই থাকা এবং বিনীতভাবে আর্জি পেশ করেই যাওয়া মু'মিনের রীতি নয়। এ সম্পর্কেই হাদীসে বলা হয়েছে, কাফের ও মুশরিক কবিরা ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ, দোষারোপ ও অপবাদের যে তাণ্ডব সৃষ্টি করতো এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষের যে বিষ ছড়াতো তার জবাব দেবার জন্য নবী (সা) নিজে ইসলামী কবিদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন ও সাহস যোগাতেন। তাই তিনি কা'ব ইবনে মালেককে (রা) বলেন ঃ

اُهْجُهُمْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبْلِ –

"ওদের নিন্দা করো, কারণ সেই আল্লাহর কসম, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ আবদ্ধ, তোমার কবিতা ওদের জন্য তীরের চেয়েও বেশী তীক্ষ্ণ ও ধারালো।"

হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন ঃ

اهجهم وجبريل معك এবং قل وروح القدس معك

"তাদের মিথ্যাচারের জবাব দাও এবং জিব্রীল তোমার সঙ্গে আছে।" এবং "বলো এবং পবিত্র আত্মা তোমার সংগে আছে।"

তাঁর উক্তি ছিল ঃ

ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه –

"মু'মিন তলোয়ার দিয়েও লড়াই করে এবং কণ্ঠ দিয়েও।"

১৪৬. জুলুমকারী বলতে এখানে এমনসব লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে যারা সত্যকে খাটো ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সম্পূর্ণ হঠকারিতার পথ অবলম্বন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কবি, গণক, যাদুকর ও পাগল হবার অপবাদ দিয়ে বেড়াতো। এ ধরনের অপবাদ দেবার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যারা তাঁর সম্পর্কে জানে না তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে তাদের মনে কু–ধারণা সৃষ্টি করা এবং তাঁর শিক্ষার প্রতি যাতে তারা আকৃষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা করা।